# পরমাণু-বোমা

প্রসাদ সেনগুপ্ত

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা

# প র মা ণু - বো মা

প্রমোদ সেনগুপ্ত

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

VICHITRA-VIDYA-GRANTHAMALA : 36

PARAMANU-BOMA
by Prasad Sengupta

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮৭

প্রকাশক
প্রকাশন বিভাগ
জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ ( প্রা. ) লি.
১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পরিবেশক
জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লি.
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯



মুদ্রাকর
শ্রীকালাচাঁদ ঘোষ
বাণী আর্ট প্রেস
৩১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

## ভূমিকা

এই পুস্তিকা পরমাণু-বোমার মূলত বিজ্ঞানগত এবং ইতিহাসগত আলোচনা। হাইড্রোজেন-বোমা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞানগত আলোচনা এখানে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, তা' কোনো পাঠকের পক্ষেই দুর্বোধ্য হওয়া উচিত নয়। পরমাণু-কেন্দ্রের বিভাজন এবং সংযোজনের ঘটনা মোটামুটি সঠিক বোঝবার জন্য পরমাণু-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা থাকা দরকার। প্রথম কয়েক পাতায় এই ধারণাই গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক এটুকু অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন ব'লে আশা করা যায়। অবশ্য এটাও মনে রাখা দরকার—কোনো বিষয়ের আলোচনাই সর্বত্র সমান সুখপাঠ্য হ'তে পারে না।

সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি অতিসংক্ষিপ্ততাদুষ্ট। এই পরিচ্ছেদটির অস্তিত্ব রাখতে হয়েছে কেবল বিষয়গত পূর্ণতা রক্ষার জন্য। অবশ্য, সঠিক অর্থে 'পূর্ণতা' দেওয়া এই পরিসরে কখনই সম্ভব নয়। এই গ্রন্থমালার অধিকাংশ সদস্যর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পুস্তিকার স্থূলত্ব নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ফলে প্রাথমিক পরিকল্পনায় 'ইউরেনিয়াম' এবং 'পরীক্ষাকালীন দুর্ঘটনা' নামে আরও দু'টি পরিচ্ছেদ যুক্ত করবার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয়!

পরমাণু-বোমা সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজেরও নানা ভুল ধারণা আছে ; অসম্পূর্ণ ধারণা তো আছেই। এই পুস্তিকা যদি কিছু পাঠকের ধারণার কিছু ভ্রান্তি এবং কিছু অসম্পূর্ণতা দূর করে, তবেই এর প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ব'লে মনে করা যাবে।

যাঁরা পরমাণু-বোমার নানা দিক নিয়ে বিস্তৃততর অধ্যয়নে আগ্রহী, তাঁদের অনুরোধ করি সম্প্রতি প্রকাশিত "The Nuclear Almanac" (Addison-Wesley, 1984) বইটি দেখতে। বইটি সর্বসাধারণের উপযুক্ত এবং অজস্র তথ্যের আকর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'ম্যানহাটান্ প্রোজেক্ট'-এর বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানী Philip Morrison 'The Physics of the Bomb' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। পরমাণু-বোমার কার্যপ্রণালী নিয়ে এটিই বোধহয় প্রথম

বিস্তৃত আলোচনা। এই প্রবন্ধটিই বর্তমান পুস্তিকা রচনায় মুখ্য প্রেরণার কাজ করেছে। চল্লিশ বছর আগে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার প্রশ্নে প্রথমেই উল্লেখ করি শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ইন্দিরা কুণ্ড-র নাম। তিনিই বারবার তাগাদা দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করিয়ে নেন, এবং তাঁর উৎসাহের ধাক্কা না-খেলে এ কাজে আমার হাত দেবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কলকাতার 'আমেরিকান্ য়ুনিভার্সিসিটি সেণ্টার'-এর গ্রন্হাগারে অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটি বই-এর সন্ধান পাওয়ায় এই কাজ দ্রুত শেষ করা সহজ হয়েছে আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় [রসায়ন বিভাগ, বারাসত সরকারী মহাবিদ্যালয়] পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পরীক্ষা ক'রে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। 'জিজ্ঞাসা'র পক্ষ থেকে রেখাচিত্র অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেন শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ পাত্র [রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ] পাণ্ডুলিপিতে আমার অসাবধানতাজনিত একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটী নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে প্রকাশনটির তদারক করেছেন 'জিজ্ঞাসা'র শ্রীশক্তি রায়চৌধুরী। শ্রীমানিকচন্দ্র দে মুদ্রণ ত্রুটীহীন করতে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। সবার কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা অবশ্যস্বীকার্য। পাঠকের মতামত এবং মন্তব্য গ্রহণ করতেও আগ্রহী রইলাম।

ডিসেম্বর,
১৯৮৬

প্রসাদ সেনগুপ্ত
পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
রাজ কলেজ, ঝাড়গ্রাম

আলোচনাসূচী

*"The peoples of this world must unite, or they will perish. This war, that has ravaged so muhc of the earth, has written these words. The atomic bomb has spelled them out for all men to understand. Other men have spoken them ; in other times, of other wars, of other weapons. They have not prevailed. There are some, misled by a false sense of human history, who hold that they will not prevail today. It is not for us to believe that. By our works we are committed to a world united, before this common peril, in law, and in humanity."*

J. R. Oppenheimer

# এক / পরমাণু বিভাজন ঃ  পরমাণু-বোমার নীতি

পরমাণু-বোমার নীতি সরলভাবে বোঝবার সুবিধে হয় যদি আমরা আংশিকভাবে এর বিজ্ঞানগত ইতিহাস অনুসরণ করি। অবশ্য, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ( অর্থাৎ, ইলেকট্রন আবিষ্কারের সময় থেকেই ) পরমাণুর গঠন নিয়ে যে উত্তেজনাময় গবেষণা শুরু হয়, এবং যা'র ইতিহাস এখন বস্তুত আমাদের সভ্যতার ইতিহাসেরই বিশিষ্ট এক অধ্যায়, সেই দীর্ঘ ইতিহাস এখানে আগাগোড়া স্মরণ করা নিরর্থক। পরমাণু-গঠনশাস্ত্র বিরাট ও জটিল ; তা'র সবটা আমাদের আপাতত দরকার নেই। পরমাণু-বোমাকে ঠিকমতো বোঝবার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই চলবে।

## পরমাণুর গঠন

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে যে জ্ঞান এখন কোনো কিশোর বিদ্যার্থীরও আয়ত্তগত ( অর্থাৎ—একটি বস্তু-কেন্দ্রের চারিদিকে ইলেকট্রন ঘোরে ! ), তা'র প্রাথমিক ধারণা 1911—14 সাল নাগাদ বিশ্বের সেরা কয়েকটি বিজ্ঞানীর মাথায় দানা বাঁধছিল। নীল্‌স্ বোর্ (Niels Bohr) 1913 সালে পরমাণুর গঠন বর্ণনা করতে গিয়ে একটি পদার্থ-কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কক্ষপথে ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের কথা বলেন। যেহেতু একটি সম্পূর্ণ পরমাণু বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ, তাই পরমাণুর আভ্যন্তরিক গঠনে দু'ধরনের বিদ্যুৎ-কণার সমতা অবশ্য প্রয়োজন। অতএব, কেন্দ্রে ধনাত্মক তড়িৎবাহী কণা ( প্রোটন ) যতগুলো থাকবে, তা'কে প্রদক্ষিণ করবে ততগুলো ঋণাত্মক তড়িৎবাহী কণা ( ইলেকট্রন )। পাঠক যেন না ভাবেন—দুর্বোধ্যতার শুরু হ'ল এখানেই। 'ধনাত্মক তড়িৎ', 'ঋণাত্মক তড়িৎ'—এ সবের অর্থ বোঝা যায় না। পাঠক আশ্বস্ত, এমনকি—খুশী, হবেন এই জেনে ঃ কোনো কণিকা 'তড়িৎ বহন করে'—এ কথার সম্পূর্ণ বা সঠিক অর্থ বিজ্ঞানেও স্থির হয়নি। চুম্বকের ধর্ম লক্ষ করলে যেমন বোঝা যায়, তা'র দুই বিপরীতধর্মী মেরু আছে, এবং এর গভীরতর অর্থ নিয়ে সাধারণ পাঠক যেমন দুশ্চিন্তা করেন না, কিংবা 'চুম্বক'কে একটি দুর্বোধ্য বস্তু ব'লেও ভাবেন না, তড়িৎবাহী বস্তু-কণাকেও ওই রকম প্রাথমিকভাবে বুঝলেই চলবে। একটি সাধারণ ব্যাটারির 'পজিটিভ্' এবং 'নেগেটিভ' প্রান্ত ( বা মেরু ) আমাদের অতি পরিচিত। মনে করা যাক, দু'টি

সমান্তরাল ধাতব পাত পরস্পরের ঈষৎ ব্যবধানে রয়েছে। এখন, ব্যাটারীর এক-একটি প্রান্ত এক-একটি পাতের সঙ্গে তার দিয়ে যুক্ত করা হ'ল। এবারে যদি ঐ দুই পাতের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বস্তু-কণা চালনা করা হয়, তবে দেখা যায়, কোনো কোনো কণিকা 'পজিটিভ্' পাতের দিকে আকৃষ্ট হয়, কেউ বা আকৃষ্ট হয় বিপরীত পাতের দিকে ; আবার অনেকে কোনো আকর্ষণই বোধ করে না। সুতরাং, বলা চলে—ধনাত্মক বা 'পজিটিভ্' পাতের দিকে আকৃষ্ট কণিকা নিশ্চয়ই ঋণাত্মক-বিদ্যুৎবাহী, ঠিক যেমন—চুম্বকের ক্ষেত্রেও বিপরীত দুই মেরুর মধ্যে আকর্ষণ হয়। যা'রা কোনো আকর্ষণ অনুভব করেনি, তা'রা তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণিকা। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে এটুকু বুঝলেই যথেষ্ট। অনায়াসে আন্দাজ করা যায় ঃ বিভিন্ন চুম্বকের মেরুর শক্তি যেমন বিভিন্ন ( কম-বেশী ) হ'তে পারে, বিদ্যুৎবাহী সব কণিকারও সমান বিদ্যুৎ বহন করা অত্যাবশ্যক নয়। কিন্তু, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি মৌলিক কণিকাদের ভিতরে যা'রা আদৌ বিদ্যুৎবাহী, তা'রা কোনো দুর্বোধ্য কারণে কেবল একটি নির্দিষ্ট মাত্রারই তড়িৎ বহন করে, তা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যাই হোক। এই মাত্রার পরিবর্তন কোনোভাবেই ঘটতে পারে না। যেমন —'প্রোটন'কে তা'র নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী বা কম বিদ্যুৎ বহনে বাধ্য করা অসম্ভব। যে কোনো মৌলিক কণিকার বিদ্যুতের পরিমাণ ঐ কণিকার অন্তরগত ধর্ম। যেহেতু সব মৌলিক কণিকাই হয় বিদ্যুৎহীন, বা একটিমাত্র নির্দিষ্ট মাত্রায় বিদ্যুৎবাহী, তাই ঐ মাত্রাকে একক ধরলে এদের সবারই বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়ায় +1, 0 বা −1।

মৌলিক কণিকাদের ভিতরে সর্বাগ্রে আবিষ্কৃত হয় প্রোটন এবং ইলেকট্রন। তৃতীয় কোনো কণা আবিষ্কার না হ'তেই পরমাণু-গঠন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা শুরু হল। নীল্স্ বোর্ বললেন—প্রোটনের ( বা প্রোটনগুচ্ছের ) চারিদিকে ইলেকট্রন তীব্র গতিতে ঘুরছে, এবং এটাই পরমাণুর গঠন। কেন্দ্রের নিকটতম ইলেকট্রনও থাকবে কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে। যদিও এইসব আকার এবং দূরত্ব এতই ছোট যে, এরা কোনো অনুবীক্ষণেরই এলাকায় পড়ে না, তবু বোঝবার সুবিধের জন্য বলা যায়—একটি পরমাণু-কেন্দ্র যদি ফুটবলের আকারের হত, তা'হলে আবর্তিত নিকটতম ইলেকট্রন থাকতো কেন্দ্র থেকে কয়েক মাইল দূরে। এ থেকে বোঝা যাবে—পরমাণুর অধিকাংশ অঞ্চলই ফাঁকা, বা বস্তুহীন। ( বহু পরমাণুতে গঠিত আমাদের দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ) এর মধ্যে, ইলেকট্রন-এ বস্তু-পরিমাণ খুবই সামান্য। অতএব, যে কোনো পরমাণুর আসল বস্তু সঞ্চিত থাকে তা'র কেন্দ্রে। নীল্স্ বোরের ধারণা-চিত্র গ্রহণ করলেও দেখা যায়, কেবল প্রোটনের জন্য পরমাণু-কেন্দ্রে যতটা বস্তু থাকা উচিত ছিল,

বাস্তবে সাধারণত থাকে তা'র অন্তত দ্বিগুণ। (অবশ্য, সাধারণ হাইড্রোজেনের কেন্দ্র একটি ব্যতিক্রম।) এ থেকে বোঝা যায়—কেন্দ্রে আরও অন্তত এক জাতের কণিকা আছে। বহু বছর বাদে (1932-এ) নিউট্রন আবিষ্কৃত হবার পরে বোঝা যায়—পরমাণু কেন্দ্রেও রয়েছে এই বিদ্যুৎহীন কণিকা, নিউট্রন।

এর পরে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে জটিলতার প্রশ্ন দেখা দেয়। যদি পরমাণু-কেন্দ্রে প্রোটন এবং নিউট্রন থেকেই থাকে, তবে তা'রা ঠিক কীভাবে থাকে—এই প্রশ্ন খুবই জরুরী হয়ে ওঠে। একত্রে বহু সংখ্যক প্রোটন থাকবার কথাই নয়; সমজাতীয় বিদ্যুৎবাহী ব'লে তাদের পরস্পরের বিকর্ষণে কেন্দ্রটি মুহূর্ত মধ্যে ভেঙে যাবার কথা। এই প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানের ইতিহাস দীর্ঘ এবং গণিত-কণ্টকিত। সব কিছুর মধ্য দিয়ে তবু কয়েকটি সরল সত্য অল্পকালের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, পরমাণুর কেন্দ্রে বিশেষ ধরনের একটি বল কাজ করে, যা মহাকর্ষীয় বল এবং বৈদ্যুতিক বলের মতোই প্রকৃতির একটি মৌলিক বল,—নিজস্ব বিচিত্রতায় স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, এই বল প্রধানত মহাকর্ষীয় বলের মতোই একটি আকর্ষক বল। এর আকর্ষণের ক্রিয়া তীব্র; কিন্তু, আক্ষরিকভাবেই, অত্যন্ত অদূরপ্রসারী। যে পরমাণুর কেন্দ্রে মাত্র কয়েকটি কণিকা আছে, সেই কেন্দ্রে প্রত্যেক কণিকাই প্রত্যেক কণিকাকে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রের আকার একটু বড় হ'লেই এটা আর সম্ভব হয় না। তখন একটি কণার আকর্ষণ তা'র নিকটবর্তী কয়েকটি কণিকার উপরেই কার্যকর হয়। বাস্তবিক, ঐ 'কেন্দ্রকীয় বল' (nuclear force) অতি অল্প দূরত্ব পর্যন্তই ক্রিয়া করতে পারে: মোটামুটি 0·0000000000002 সেণ্টিমিটারের ভিতরে। [এই রাশিকে সংক্ষেপে '$2\times10^{-13}$ সেণ্টিমিটার' লেখা হয়।] এর চেয়ে দূরে এর ক্রিয়া অতি দ্রুত ক্ষীণ হ'তে থাকে। পরমাণু-কেন্দ্রের আকারও অবশ্য খুব ছোট; কিন্তু, উল্লিখিত রাশির তুলনায় বেশ কয়েক গুণ বড় হ'তে পারে। তৃতীয়ত, এই বল প্রধানত আকর্ষক বল; কিন্তু, এর একটি তীব্র বিকর্ষক অন্তঃপুর বা কেন্দ্রীয় অঞ্চল আছে—যা'র ক্রিয়া কার্যকর হয় মাত্র $0·3\times10^{-13}$ সেণ্টিমিটারের ভিতরে, বা 0·3 ফের্মির ভিতরে। [সংক্ষিপ্ততার জন্য $10^{-13}$ সেণ্টিমিটারকে 1 ফের্মি বলা হয়,—স্বনামধন্য পদার্থবিদ্ এন্রিকো ফের্মি (Enrico Fermi)-র নাম অনুসারে।] অতএব, 0·3 ফের্মির পর থেকে 2 ফের্মি পর্যন্ত ঐ বলটি আকর্ষক বল। পাঠক লক্ষ করবেন, কেন্দ্রীয় বিকর্ষক অঞ্চলটির চেয়ে বাইরের আকর্ষক অঞ্চলের বিস্তার ছ'-সাত গুণ বেশী। চতুর্থত, ঐ কেন্দ্রকীয় বল কণিকাদের তড়িৎ-নিরপেক্ষ; অর্থাৎ, দু'টি প্রোটনের ভিতরে, দু'টি নিউট্রনের ভিতরে, অথবা একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের ভিতরে ঐ বলের মাত্রা মোটামুটি একই।

উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের একটি প্রত্যক্ষ ফলের কথা এখানে বলা দরকার। খুব ছোট পরমাণুর কেন্দ্রর কথা বাদ দিলে, প্রায় সমস্ত পরমাণুর কেন্দ্রেই কণাগুলোর বন্ধন-শক্তি মোটামুটি অভিন্ন থাকে। অর্থাৎ, একটি কণা যে শক্তিতে কেন্দ্রের সঙ্গে আবদ্ধ রয়েছে তা' কার্যত কেন্দ্রের আয়তন নিরপেক্ষ এবং প্রায় সব পরমাণুর কেন্দ্রের পক্ষেই সমান। বলা বাহুল্য, সব কণিকাই সব কণিকাকে আকর্ষণ করলে এটা ঘটতো না, এবং সে ক্ষেত্রে বড় আকারের একটি কেন্দ্রে এক-একটি কণিকার বন্ধনশক্তি অনেক বেশী হত। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়ঃ কেন্দ্রে কণিকার সংখ্যা মোটামুটি দশ থেকে দেড়শোর মধ্যে হ'লে প্রতিটি কণার বন্ধন-শক্তি প্রায় একই হয়। যে সব কেন্দ্রে কণিকার সংখ্যা খুবই কম ( 2, 3, 4 ইত্যাদি ) তা'দের—অর্থাৎ, খুব ক্ষুদ্র পরমাণুর—জন্য আপাতত আমাদের আগ্রহ নেই ; কিন্তু, খুব বৃহৎ পরমাণুর কেন্দ্র সম্পর্কে আমরা আগ্রহী, বিশেষত যে সব কেন্দ্রে দু'শোরও বেশী কণিকা আছে। এইবারে এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'কথা বলা যাক।

মনে রাখতে হবে : বহু সংখ্যক প্রোটনের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতির জন্য পরস্পরের ভিতরে যে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ থাকা উচিত, তা' কিন্তু সব ক্ষেত্রেই রয়েছে। কিন্তু, উল্লিখিত কেন্দ্রকীয় বলের আকর্ষণী প্রভাবে পরমাণুর কেন্দ্র অভগ্ন থাকতে পারে। খুব বড় আকারের পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যাও খুব বেশী ; যার ফলে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণী বল এ ক্ষেত্রে প্রবলতর। অথচ, আগেই আমরা যা' বুঝতে পেরেছি, কেন্দ্রকীয় বল বড় আকারের কেন্দ্রে প্রবলতর নয়। এর ফলে খুব বড় পরমাণুর কেন্দ্র তুলনামূলকভাবে কম দৃঢ় হয় [অর্থাৎ, এই রকম কেন্দ্র তুলনামূলকভাবে অল্প আঘাতেই ভাঙতে পারে]।

পরমাণুর কেন্দ্রে আবদ্ধ প্রোটন ও নিউট্রনের বন্ধন-শক্তির উৎস কী? গভীরতর স্তরে এই উৎস-সন্ধান হয়তো সহজ নয় ; কিন্তু, এর একটা সহজ আপাত ব্যাখ্যা আছে। একটি পরমাণু-কেন্দ্রের সমস্ত কণিকার বস্তু-পরিমাণের যোগফলের চেয়ে সংবদ্ধ কেন্দ্রটির বস্তু-পরিমাণ সামান্য 'কম হয়। অর্থাৎ, কণিকাগুলো ঐভাবে একত্র থাকাকালে বস্তুর সামান্য হ্রাস হয়। আইনস্টাইনের সুপরিচিত ফর্মুলা $E=mc^2$ অনুসারে কিছুটা বস্তুর (m-এর) হ্রাসপ্রাপ্তির অর্থ, উপযুক্ত পরিমাণের শক্তির (E-র) বিকাশ। [C হ'ল শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগ।] উদাহরণ হিসেবে হিলিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রের কথা ধরা যাক। এই কেন্দ্রে দু'টি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রন আছে। এদের স্বতন্ত্র বস্তু-পরিমাণের যোগফল হয় $6{\cdot}69418\times10^{-24}$ গ্রাম ( অর্থাৎ, দশমিকের পরে তেইশটা শূন্য দিয়ে 669418 লিখতে হবে )। কিন্তু, সম্পূর্ণ হিলিয়াম-কেন্দ্রটির বস্তু-পরিমাণ এর চেয়ে

সামান্য কম। এই পার্থক্য দেখা দিয়েছে কিছুটা বস্তু শক্তিতে রূপান্তরের ফলে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, ঠিক ঐ পরিমাণের শক্তিই কেন্দ্রে আবদ্ধ কণিকাদের বন্ধন-শক্তি হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে।

স্বা ভা বি ক তে জ স্ক্রি য় তা

ফরাসী পদার্থবিদ্ বেকেরেল (A. H. Bequerel) গত শতাব্দীর শেষ দিকে নানা পদার্থের 'প্রতিপ্রভা' (fluorescence) নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন—যার সঙ্গে আমাদের এই আলোচনার কোনো সম্পর্ক থাকবার কথা নয়। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার জন্য তিনি তাঁর ডেস্কের ড্রয়ারে অনেক রকমের খনিজ পদার্থ সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন এবং ব্যস্ততার জন্য অনেক দিন ধ'রে সেগুলোয় হাত দিতে পারেন নি। ঐ ডেস্কেরই এক পাশে অনেকগুলো বাক্সে বন্ধ ছিল অনেক ফটো-প্লেট, যেগুলো বেকেরেল মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন পরীক্ষাগত নানা ঘটনার ছবি তোলবার জন্য। একদিন ওর একটি বাক্স থেকে একটি ফটো-প্লেট বা'র ক'রে বেকেরেল কোনো একটি ঘটনার ছবি তোলেন এবং অপ্রস্তুত হয়ে দেখতে পান—ঐ ফটো-প্লেটে কেমন ক'রে যেন আগেই আলো লেগেছিল। তখন তিনি অন্যান্য বাক্সের ফটো-প্লেট ব্যবহার করলেন ; কিন্তু, ফলাফল মোটেই অন্য রকম হ'ল না। এইবারে তাঁর সন্দেহ হ'ল—ডেস্কের ভিতরের ঐ খনিজ পদার্থের ভিতরে কেউ হয়তো এর জন্য দায়ী হ'তে পারে ; এবং শেষ পর্যন্ত বা'র ক'রেও ছাড়লেন, ইউরেনিয়ামের এক টুকরো আকরিক (ore) এর জন্য দায়ী। তখন ইউরেনিয়ামের ঐ অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আর কারোরই নজরে আসেনি। এর কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত ঐ মৌলিক পদার্থের কোনো কদরই ছিল না। যদিও ইউরেনিয়াম আবিষ্কৃত হয় সুদূর 1789 সালে ; কিন্তু, কেউ একে নিয়ে বিশেষ নাড়াচাড়া করেন নি। বেকেরেলের ঐ আকস্মিক আবিষ্কারের পরে ইউরেনিয়াম বিজ্ঞানী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে (এবং 1938 সালের পর থেকে এর কদর একেবারে তুঙ্গে ওঠে)। ঐ নতুন ঘটনার নাম হয় 'তেজস্ক্রিয়তা' (radioactivity)। অচিরেই দেখা যায় : থোরিয়াম্ এবং অ্যাক্টিনিয়াম্ নামে আরও দু'টি মৌলিক পদার্থেরও ঐ জাতীয় ধর্ম আছে। এরা সকলেই অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পরমাণু, যা'দের কেন্দ্রগুলো বড় এবং ভারী। বেকেরেলের আবিষ্কার ফ্রান্সের মাদাম কুরী (Marie S. Curie)-কে আকর্ষণ করে। তিনি সন্দেহ করেন, ইউরেনিয়ামের ঐ আকরিকে অন্য কোনো পদার্থ ছিল যা আরও বেশী তেজস্ক্রিয়। অনেক দিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমে মাদাম কুরী তাঁর সন্দেহের পদার্থের কয়েক মিলিগ্রাম আলাদা করতে পারেন 1898 সালে, এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জন্য এর নাম

দেন 'রেডিয়াম'। (এর কিছু কাল পরে তিনি আরও তেজস্ক্রিয় একটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পান, এবং তাঁর জন্মভূমি পোল্যাণ্ডের নাম মনে রেখে এর নাম দেন 'পোলোনিয়াম'।) ঐ শতাব্দী শেষ হ'তে না হ'তে আরও কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ লক্ষ্য করা সম্ভব হয়।

কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতার ফলে কিছু কিছু পরমাণুর কেন্দ্র সুস্থিত (stable) হ'তে পারে না। বিশেষ বিশেষ কণিকার বা বিকিরণের উৎসারের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রটি সুস্থিত হ'তে চেষ্টা করে। একেই আমরা বলব—পরমাণু ভেঙে-যাওয়া। প্রকৃতিতে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়, তা' থেকে আল্‌ফা-কণিকা বা বিটা-কণিকার উৎসার হ'তে পারে। আল্‌ফা-কণিকা কার্যত হিলিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্র, অর্থাৎ—দু'টি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রনের সমন্বয়; অতএব, মোটামুটি ভারী কণিকা এবং দু'টি প্রোটনের অস্তিত্বের হেতু দু'টি ধনাত্মক একক বিদ্যুৎবাহী। বিটা-কণিকা নিছক ইলেকট্রন ছাড়া কিছুই নয়; অতএব, খুবই হাল্কা কণিকা (প্রোটন বা নিউট্রনের প্রায় দু' হাজার গুণ হাল্কা), এবং একটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী কণা। সেই হিসেবে একটি বিটা-কণা কোনো কেন্দ্র থেকে বা'র হয়ে এলে মনে করতে হবে—ঐ কেন্দ্রটির একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎ-কণা (অর্থাৎ—প্রোটন) বেড়ে গেল। (অর্থাৎ, ঋণাত্মক বিদ্যুৎ হ্রাস ধনাত্মক বিদ্যুৎ বৃদ্ধির তুল্য*।) এর গভীরতর তাৎপর্য আপাতত আমরা খুঁজতে চাই না। কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আল্‌ফা বা বিটা-কণিকা উৎসারের পরেও অনেক ক্ষেত্রে সেই কেন্দ্র থেকে এক ঝলক গামা-রশ্মি বা'র হয়ে আসতে পারে। গামা-রশ্মির প্রকৃতি এক্স্‌-রশ্মির মতোই; কিন্তু, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও কম ব'লে কঠিন বস্তুকে ভেদ করার ক্ষমতা আরও বেশী এবং প্রাণী-দেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আল্‌ফা এবং বিটা কণিকা অবশ্য সামান্য বাধাতেই থেমে যায়।

দেখা যাচ্ছে, আল্‌ফা বা বিটা, যে কণিকাই বার হয়ে আসুক, ঐ পরমাণু কেন্দ্রে মোট তড়িতের (ধনাত্মক) পরিমাণ (বা প্রোটনের সংখ্যা) বদলে যাবেই। যেহেতু কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যার সঙ্গে বাইরের ইলেকট্রন-সংখ্যা সমান হয় এবং শেষোক্ত সংখ্যার উপরেই পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে, তাই মৌলিক পদার্থের আলাদা নামকরণই হয় কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা অনুসারে। ঐ সংখ্যা

---

* আসলে, কেন্দ্রে বিটা-কণার (বা ইলেকট্রনের) কোনো সঞ্চয় নেই। একটি নিউট্রন একটি প্রোটনে পরিণত হ'তে পারে—যখন একটি বিটা-কণাও জন্ম নেয়। এইভাবেই প্রোটনের সংখ্যা বেড়ে যায়। নিউট্রন যেহেতু বিদ্যুৎহীন, প্রোটন ও বিটা-কণার মিলিত বিদ্যুৎও 'শূন্য' হওয়ায় $n \rightarrow p + \beta$ এই ঘটনায় বিদ্যুতের সাম্য রক্ষা পায়।

বদলে যাবার অর্থ হল, পদার্থটিই বদলে যাওয়া। অতএব, কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্র থেকে আল্ফা বা বিটা-কণিকা বা'র হলে ঐ পদার্থ অন্য এক পদার্থে পরিণত হয়।

তেজস্ক্রিয়তার দু'টি বৈশিষ্ট্যর কথা এখানে বলা যেতে পারে। প্রথম হল— এই জাতীয় ক্রিয়ার অদ্ভুত অনিশ্চয়তা। কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তুর একটি তাল হাতে নিয়ে কোনোভাবেই বলা যাবে না, তা'র কোন্ পরমাণুটি কখন ভাঙবে, কিংবা কোন্টির আগে কোন্টি ভাঙ্বে। অতএব, এ ক্ষেত্রে পরমাণুর 'গড়' (average) আয়ুর কথা ভাবা যেতে পারে। একই তেজস্ক্রিয় পদার্থের বহু পরমাণুর উপরে সমীক্ষা চালিয়ে এই গড়পরতা আয়ু বা'র করা যায়। কিন্তু এই হিসেব খুব বেশী কাজে লাগে না। এর চেয়ে বেশী কাজে লাগে 'অর্ধায়ু' (half-life)। এটা কিন্তু তথাকথিত গড়-আয়ুর অর্ধেক নয়। এক তাল তেজস্ক্রিয় কোনো পদার্থে মোট যতগুলো পরমাণু আছে, তা'র অর্ধেক ভেঙে যেতে যে সময় লাগে, তা'ই হ'ল ঐ পদার্থের 'অর্ধায়ু'। এর দ্বিগুণ সময়ে কিন্তু সব পরমাণু ভাঙবে না। এই প্রসঙ্গে তেজস্ক্রিয়তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও আমরা স্মরণ করতে পারি। তেজস্ক্রিয়তার এক অদ্ভুত নিয়ম আছে : এক তাল তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থে পরমাণু ভাঙার হার উপস্থিত মোট পরমাণুর সংখ্যার অনুপাতে কমতে থাকে। অতএব, যখন অভগ্ন পরমাণুর সংখ্যা খুব ক'মে আসে, তখন আর ভেঙে যাবার ঘটনাও বিরল হয়ে আসে। এই কারণে ঐ এক তাল বস্তুতে ঐ পদার্থের অভগ্ন পরমাণুর অস্তিত্ব কার্যত অতি দীর্ঘ কাল ( তাত্ত্বিক বিবেচনায় —অনন্তকাল ! ) থেকে যায়। যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু মাত্র তিন মিনিট, তিন ঘণ্টা বাদেও সে সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় না ; যদিও তা'র অস্তিত্ব ক্রমশই ক্ষীণতর হ'তে থাকে। বাস্তবে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু মুহূর্তকাল থেকে শুরু করে লক্ষাধিক বছরও হয়ে থাকে। অবশ্য এখন তেজস্ক্রিয় বস্তুর যে দীর্ঘ তালিকা আমাদের হাতে আছে, তা'র অধিকাংশই কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় বস্তুর সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও, যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে তেজস্ক্রিয়তার নিরাসক্তির কথাও এখানে বলা যেতে পারে। উত্তাপ, চাপ ইত্যাদি যা'ই প্রয়োগ করা যাক না-কেন, কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা একটু বাড়ানো বা কমানো যায় না।

সব শেষে ব'লে রাখা দরকার—কোনো তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কেন্দ্র থেকে বিটা-কণিকা ( ইলেকট্রন ) বা'র হ'লেও এটা ভাবা ঠিক নয় যে, ঐ পরমাণুর কেন্দ্রে ইলেকট্রন সঞ্চিত ছিল। কোনো পরমাণুর কেন্দ্রেই ইলেকট্রন মজুত থাকে না।

যে ইলেকট্রন তেজস্ক্রিয় কেন্দ্র থেকে বা'র হয়েছে তা পূর্ব মুহূর্তেই সৃষ্ট হয়েছিল বিশেষ ক্রিয়ায়। (পূর্ববর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

কৃ ত্রি ম তে জ স্ক্রি য় তা

কোনো বস্তুর পরমাণুর কেন্দ্রকে সূক্ষ্ম কণিকা দিয়ে আঘাত করলে কী হয় —এই প্রশ্নকে ঘিরে প্রথমে পরীক্ষা চালান রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford)। কিন্তু, তখন আঘাত করার অস্ত্র ছিল মূলত প্রোটন এবং আল্‌ফা-কণিকা। এদেরই কোনো একটির এক ঝাঁক কণা বর্ষণ করা হত পরীক্ষাধীন একটি বস্তুর উপরে। কিন্তু প্রোটন এবং অ্যাল্‌ফা-কণা, দু'টিই তাড়িৎ বহন করে। সুতরাং, এরা কোনো পদার্থের ভিতরে ঢুকতেই সেই পদার্থের বিদ্যুৎবাহী কণিকাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানা-পোড়েনে এদের গতি রুদ্ধ হয়। আগেই বলা হয়েছে— পরমাণুর গঠন যে ধরনের, তা'তে দেখা যায় তা'র অধিকাংশ আয়তনই ফাঁকা। পরমাণুর যা' কিছু বস্তু—তার প্রায় সবটাই সঞ্চিত আছে তা'র অতি ক্ষুদ্র কেন্দ্র অঞ্চলে। অতএব, ঐ নিক্ষিপ্ত কণিকার স্রোত কোনো কঠিন পদার্থের ভিতরে যে সামান্য পরিমাণে ঢোকে (এক মিলিমিটারেরও অনেক কম), তা'তে প্রায় কোনো পরমাণুর কেন্দ্রের সঙ্গেই তা'র সাক্ষাৎ হয় না। এই সমস্যার প্রথম কার্যকর সমাধান হয় 1932 সালে নিউট্রন আবিষ্কারে। নিউট্রন বিদ্যুৎহীন কণিকা। সুতরাং যে কোনো পদার্থের গভীরে তার ঢোকার ক্ষমতা অনেক বেশী। অতএব, লক্ষ্যবস্তুর কোনো পরমাণু কেন্দ্রের সঙ্গে তা'র সংঘাতের সম্ভাবনাও বেশী।

কৃত্রিমভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রথমে তৈরি করেন ফ্রান্সের ফ্রেডেরিক জোলিও এবং আ ইরিন্‌ কুরী 1934 সালে, অবশ্য নিউট্রন ব্যবহার না-করেই। এঁরা অ্যালুমিনিয়ামের পাতের সামনে খানিকটা পোলোনিয়াম রাখেন। তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম থেকে আল্‌ফা-কণিকা বা'র হয়ে অ্যালুমিনিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করে। কয়েক মিনিট পরে দেখা যায়, একটি নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী হয়েছে—যার অর্ধায়ু আড়াই মিনিট। পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়, এই নতুন বস্তুটি আসলে ফস্‌ফোরাস্‌। অবশ্য, সাধারণ ফস্‌ফোরাস্‌ তেজস্ক্রিয় নয়। কিন্তু, সাধারণ ফস্‌ফোরাস্‌-পরমাণুর কেন্দ্রে 15টি প্রোটন এবং নিউট্রন ও প্রোটনের যোগফল 31 হবার কথা। এই কারণে ফস্‌ফোরাস্‌কে সাংকেতিকভাবে লেখা হয় $_{15}P^{31}$; কিন্তু, নতুন তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফোরাসের সংকেত হয় $_{15}P^{30}$। অতএব, এর কেন্দ্রের গঠনটি স্বাভাবিক নয়, এবং সেই কারণেই তেজস্ক্রিয়তা দেখা দেয়। [লক্ষণীয়: কেন্দ্রে যতক্ষণ প্রোটনের সংখ্যা 15, ততক্ষণ ঐ পদার্থকে ফস্‌ফোরাস্‌ই বলা হবে। আমরা আগেই বলেছিলাম—কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা

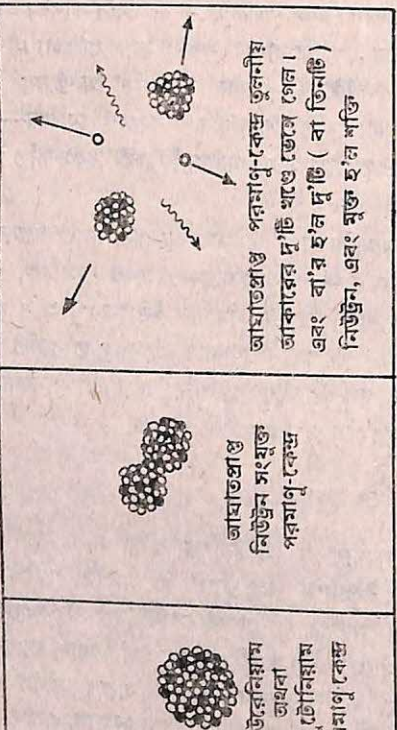
দিয়েই পদার্থের রাসায়নিক পরিচয়ের এবং নামের তফাত হয়।] এর অল্প কালের ভিতরেই এন্‌রিকো ফের্মি প্রমুখ গবেষকরা লক্ষ করেন—নিউট্রন দিয়ে অন্য পরমাণুকে আঘাত ক'রে অজস্র তেজস্ক্রিয়, নতুন পদার্থ তৈরি করা যায়। এই সব কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তায় কেবল আল্‌ফা- বা বিটা-কণিকা ছাড়াও প্রোটন বা নিউট্রনের উৎসার সম্ভব; গামা-রশ্মির কথা বলা বাহুল্য। ফের্মি আরও লক্ষ করেন: দ্রুতগতি নিউট্রনের তুলনায় শ্লথগতি নিউট্রনের উপযোগিতা এ কাজে অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে 'শ্লথগতি' বলতে বোঝায়—বাতাসের অণু সাধারণ অবস্থায় যে গতিতে ভ্রাম্যমান, মোটামুটি সেই রকম গতি; এবং এই গতি সেকেণ্ডে প্রায় দু' কিলোমিটার।

তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি যখন এইসব গবেষণা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, তখন পাশাপাশি অগ্রসর হচ্ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের, অথচ প্রাসঙ্গিক, গবেষণা: কী ভাবে সূক্ষ্ম কণার [ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির] অতি তীব্রগতি একটি স্রোত তৈরি করা যায়। পরমাণু গবেষণায় এই রকম তীব্রগতি কণিকা-স্রোতের গুরুত্ব অসীম। তৃতীয় দশকের শুরুতেই শুরু হয়ে এই গবেষণা পরবর্তী কুড়ি বছরে উন্নতির অপূর্ব স্তরে পেঁছেছিল।

## ই উ রে নি য়া মে র 'বি ভা জ ন'

সুপরিচিত নানা পরমাণুকে নিউট্রনবিদ্ধ ক'রে নানা নতুন পরমাণু পাওয়া যেতে লাগল। জার্মানী, ইংল্যাণ্ড্ এবং ফ্রান্সে এই জাতীয় পরীক্ষা হ'তে লাগল প্রচুর পরিমাণে। 1934 সালের পর থেকেই ফের্মি এবং তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী পরমাণু তৈরি করার, যেহেতু ইউরেনিয়ামই সবচেয়ে ভারী পরমাণু, যা' প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। ফের্মি ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করার অনেকগুলো পরীক্ষা চালান, এবং মোট চার রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ সৃষ্টি করেন—যা'রা প্রত্যেক বিটা-কণিকা (ইলেকট্রন) ত্যাগ করে। ফের্মি মনে করলেন—তিনি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেঁছেছেন। তাঁর যুক্তি আমাদের প্রাথমিক জ্ঞান দিয়েই আমরা অনুসরণ করতে পারি। ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রে নিউট্রন প্রথমে যুক্ত হয়েছে, যা'র ফলে ঐ পরমাণুতে একটি নিউট্রন বেড়েছে, যদিও প্রোটন বাড়েনি। যেহেতু প্রোটনের সংখ্যা একই থাকলে পরমাণুর রাসায়নিক পরিচয়ও একই থাকে, অতএব ঐ সংযুক্ত পরমাণুকেও 'ইউরেনিয়াম' বলতে হবে। কিন্তু এর পরে যদি ঐ পরমাণু একটি বিটা-কণা ত্যাগ করে, তবে তা'র ঋণাত্মক বিদ্যুতের একটি একক হ্রাস পায়; অর্থাৎ—ধনাত্মক বিদ্যুৎ একটি বাড়ে; অর্থাৎ প্রোটন একটি বাড়ে। অতএব, ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা 92 ব'লে

এই নতুন পরমাণুর প্রোটনের সংখ্যা হবে 93। এইভাবে প্রোটনের সংখ্যায় ইউরেনিয়ামকে ডিঙিয়ে যাওয়া গেল ব'লে ফের্মি মনে করলেন। কিন্তু অনেকেই ফের্মির সঙ্গে একমত হলেন না। কারণ, শেষ অবধি বিটা-কণা বা'র হয়ে যে




ভারী বা বড় আকারের পরমাণু-কেন্দ্রের বিভাজন। এখানে একটিমাত্র বিভাজন দেখানো হ'ল। নির্গত নিউট্রনগুলো আবার নিকটবর্তী পরমাণু-কেন্দ্র বিভাজন ঘটাতে পারে। এইভাবেই দ্রুতগতি বিভাজনধারা গ'ড়ে ওঠা সম্ভব।

পদার্থের পরমাণু তৈরী হ'ল, তা'র সঠিক পরিচয়ের সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল না ; ফের্মি তা'র পরিচয়টা নিছক কল্পনা ক'রে নিলেন। এমনও তো হয়ে থাক'তে পারে ঃ নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্র একাধিক ছোট টুক্‌রো হয়ে গিয়েছে,

এবং বিটা-কণিকা ঐ রকম টুকরো থেকেই বা'র হচ্ছিল। অতএব, ব্যাপারটি ওখানেই চাপা রইল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে আইরিন্ কুরী, জার্মানীতে অটো হান্ (Otto Hahn) ও স্ট্রাস্মান্ (F. Strassmann), এবং লিজে মাইটনার্ (Lise Mietner) চেষ্টা শুরু করলেন ইউরেনিয়ামকে ডিঙিয়ে যাবার। আবার অনেক নতুন তেজস্ক্রিয় পরমাণু তৈরী হ'ল, কিন্তু, তাদের পরিচয় জানা সহজ হ'ল না বিশেষ এই কারণে যে, অত্যন্ত অল্প পরিমাণে তৈরী হচ্ছিল নতুন পদার্থগুলো। 1938 সালে অটো হান্ নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়ামকে আঘাত ক'রে এমন একটি তেজস্ক্রিয় বস্তু পেলেন যা' অতি সযত্ন রাসায়নিক পরীক্ষায় যথেষ্ট হাল্কা একটি পদার্থ ব'লেই প্রমাণিত হ'ল। দেখা গেল, এই বস্তুটির গুণাবলী ঠিক বেরিয়ামের তুল্য। হান্ চাইছিলেন, ইউরেনিয়ামের সঙ্গে নিউট্রন যুক্ত ক'রে আরও ভারী পরমাণু গড়তে; গড়লেন বেরিয়াম, যা' ইউরেনিয়ামের চেয়েও ঢের হাল্কা। বিস্মিত হান্ যখন এর ব্যাখ্যা খুঁজছিলেন, তখন ফ্রিশ (O. R. Frisch) এবং মাইট্নার্ এর ব্যাখ্যায় বললেন: এটা একটা নতুন ধরনের ঘটনা। নিউট্রনের আঘাতে এ ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্র তুলনীয় আকারের দু'টি টুকরোয় ভেঙে গিয়েছে। এ ঘটনার কী নাম দেওয়া যেতে পারে ঠিক করতে না-পেরে ফ্রিশ্ মার্কিন জীব-বিজ্ঞানী আর্নল্ড্ (William A. Arnold)-কে ঘটনাটির বর্ণনা দিয়ে নামকরণের সমস্যার কথা বললেন। আর্নল্ড্ জানালেন—জীব-বিজ্ঞানেও জীব-কোষের বিভাজনের ঘটনা আছে। এই ঘটনাকেও অতএব 'বিভাজন' (fission) বলা যেতে পারে। —সেই নামটাই আজও বজায় আছে।

ইউরেনিয়াম বিভাজনের সম্পূর্ণ ঘটনাটি তা'হলে এতক্ষণে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে তিন রকমের ইউরেনিয়ামের মিশ্রণ থাকে। তা'র মধ্যে একটির পরিমাণ নগণ্য হওয়ায় তাকে আলোচনার বাইরে রাখা যায়। বাকী দু'টিকে সাংকেতিকভাবে লেখা যায় $_{92}U^{238}$ এবং $_{92}U^{235}$। (আবার স্মরণ করা যেতে পারে: প্রোটনের সংখ্যাটি নীচে, এবং প্রোটন ও নিউট্রনের মিলিত সংখ্যাটি উপরে রাখা হয়।) প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের প্রায় সবটাই $U^{238}$; $U^{235}$ থাকে মাত্র শতকরা 0·71 ভাগ। এই দুই ইউরেনিয়ামের চরিত্রে বিশিষ্ট পার্থক্য অনেক আছে, যদিও 'বিভাজন'-এর চূড়ান্ত ফল একই ধরনের। ধরা যাক, $U^{238}$-কে নিউট্রন (সংকেত: $_0n^1$) আঘাত করায় 'বিভাজন' হ'ল। এর ফলে উৎপন্ন হবে 'বেরিয়াম' ($_{56}Ba^{145}$) এবং 'ক্রিপ্টন্' ($_{36}Kr^{94}$)। কিন্তু, স্বাভাবিক বেরিয়াম এবং স্বাভাবিক ক্রিপটন (যথাক্রমে $_{56}Ba^{138}$ এবং $_{36}Kr^{84}$) থেকে এদের আলাদা এবং অস্বাভাবিক গঠনের দরুন ঐ বিভাজনজাত পরমাণু কেন্দ্রগুলোর তেজস্ক্রিয়তা থাকে। (ইউরেনিয়ামের

বিভাজনের ফল অন্য রকমও হ'তে পারে ; কিন্তু আলোচিত রূপটিই বেশী প্রত্যাশিত। ) তেজস্ক্রিয়তার ফলেও অবশ্য পরমাণু-কেন্দ্র 'ভেঙে যায়' ; কিন্তু, 'বিভাজন'-এর ঘটনাটি তার সঙ্গে ঠিক তুলনীয় নয়। কারণ, এক্ষেত্রে কেন্দ্রটি তুলনীয় আকারের একাধিক খণ্ডে ভাঙে। তত্ত্বগতভাবে, এমনকি বাস্তবেও, প্রায় যে কোনো পরমাণু-কেন্দ্রেরই বিভাজন হ'তে পারে, যদিও বড় বা ভারী পরমাণুর কেন্দ্রকে ভাঙা সহজতর। আমরা আগেই জেনেছিলাম—কেন্দ্রকীর বলের কিছু অদ্ভুত চরিত্রের জন্য বহু সংখ্যক পরমাণুর ক্ষেত্রেই কেন্দ্র-কণাগুলো মোটামুটি একই দৃঢ়তায় বাঁধা থাকে। কেন্দ্রে কণিকার সংখ্যা দু'শোরও বেশী হয়ে গেলে এই বাঁধন ক্রমশ আল্গা হয়। ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে কেন্দ্র-কণাগুলো হাল্কা ( অথবা মধ্যম-ভারী ) পরমাণুর তুলনায় অনেক দুর্বলভাবে বদ্ধ। এর বিভাজনে যে মধ্যম-ভারী পরমাণুরা তৈরী হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র-কণাগুলো যথারীতি দৃঢ়বদ্ধ। বিভাজনের এ ধরনের ঘটনা যখনই ঘটে, তখনই কিছু পরিমাণ বস্তু অন্তর্হিত হয় এবং তা' শক্তি হিসেবে প্রকাশ পায়। ( বাস্তবে এই বিভাজনজাত শক্তি কী কী ভাবে প্রকাশ পায়, তা' আমরা পরে আলোচনা করব। ) ইউরেনিয়ামের মতো ভারী পরমাণুর বিভাজনে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ শক্তি মুক্ত হয়। একটি তুলনাতে এই পরিমাণ খানিকটা বোঝা যাবে। যখন আমরা কয়লা পুড়িয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করি, তখন কয়লার একটি পরমাণু থেকে যে শক্তি পাই, একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনে তা'র চার কোটি গুণ শক্তি পাওয়া যায়। অবশ্য, তা' হ'লেও মাত্র একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনের তাপ আমাদের বাস্তব কোনো চাহিদাকে মেটাবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়, এবং একসঙ্গে বহু পরমাণুর বিভাজন ঘটাতে না পারলে এই উত্তেজক আবিষ্কারের বাস্তবমূল্য সামান্যই।

## না ম - বি ভ্রা ট

এতক্ষণের আলোচনা থেকে দু'এক মিনিটের জন্য আমরা স'রে যাচ্ছি। প্রায়ই দেখা যায়—কোনো লেখক যখন 'আণবিক বোমা' কথাটি ব্যবহার করেন, তখনই বিজ্ঞান-সচেতন কিছু সতর্ক পাঠক তাঁকে শাসন ক'রে বলেন : ওটি আসলে 'পারমাণবিক বোমা'! নামকরণের বিষয়ে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য এখানেই ব'লে নেওয়া ভালো।

পরমাণুর দু'টি অংশ আছে : কেন্দ্র এবং বাইরের ভ্রাম্যমান ইলেকট্রনগুচ্ছ —এ কথা আমরা জানি। অতএব, 'পরমাণু' শব্দটি ব্যবহার করলে তার সমস্ত অংশকেই বোঝানো উচিত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সাধারণত এই নিয়ম মানেন না।

'পারমাণবিক' বিশেষণটি তাঁরা সাধারণত বাইরের ইলেকট্রনপুঞ্জ সম্পর্কেই প্রয়োগ করেন। উদাহরণ হিসেবে 'পরমাণু-বিজ্ঞান' (atomic physics), 'পারমাণবিক গঠন' (atomic structure), 'পারমাণবিক বর্ণালী' (atomic spectrum) ইত্যাদি প্রচলিত বিষয়গুলো স্মরণ করা যেতে পারে। এই বিষয়গুলোর সব ক'টিতেই পরমাণুর কেন্দ্রকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়। কিন্তু, তা'হলে 'পারমাণবিক শক্তি'র অর্থ কী দাঁড়ায়? এ'ক্ষেত্রেও তবে 'atomic energy' বলতে পরমাণুর ইলেকট্রনীয় ত্বকের সঙ্গে জড়িত শক্তিকে বোঝানো উচিত; কেন্দ্রের কথা ভাবা উচিত নয়। পরমাণুর বহির্ভাগের ইলেকট্রনীয় সজ্জার পরিবর্তনে শক্তির প্রকাশ যদি সম্ভব হয়, এবং এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যদি বোমা তৈরি করা যায়, তবে তা'কে 'পরমাণু-বোমা' বা 'পারমাণবিক বোমা' বলা যেতে পারে। কিন্তু, কেবলমাত্র রাসায়নিক বোমাগুলোই ঐ প্রণালীতে কাজ করে, যা'দের শক্তি-প্রকাশের পরিমাণ পরমাণু-বোমার তুলনায় নগণ্য। পৃথিবীর, বহু দেশে 'Atomic Energy Commission' নামে যে সংগঠন রয়েছে তা'রাও পরমাণুর বহির্ভাগের ইলেকট্রন নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। এ ক্ষেত্রে 'atomic' বিশেষণটি কেন্দ্রসমেত সম্পূর্ণ পরমাণুকেই গ্রহণ করেছে। অতএব, দেখা যাচ্ছে—বিজ্ঞানীরা এ ক্ষেত্রে নিজেদের তৈরী নিয়ম নিজেরাই ভেঙেছেন; নইলে তাঁরা Atomic Energy Commission-কে 'Nuclear Energy Commission' বলতেন। সুতরাং, নামকরণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যুক্তিগ্রাহ্য বা ধরাবাঁধা নিয়মের চেয়ে খেয়ালকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন বেশী। অতএব, যে নিয়মে (বা অনিয়মে) 'nuclear energy'-র পরিবর্তে 'atomic energy' ইংরেজীতে চলে, সেভাবেই বাংলাতেও 'আণবিক বোমা'র ব্যবহার খুব আপত্তির বিষয় হওয়া উচিত নয়। আমাদের আলোচনাতে আমরা অবশ্য 'পরমাণু-বোমা', 'পরমাণু-শক্তি' ইত্যাদি নামই ব্যবহার করেছি।

## বি ভা জ ন - ধা রা

1938 সালের শেষ দিকে বের্লিনে অটো হান্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম বিভাজনের যে ঘটনা আবিষ্কার করলেন, এবং ফ্রিশ্ ও মাইট্নার তা'র যে ব্যাখ্যা দিলেন, তা' 1939-এর জানুয়ারীতেই আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের গোচরে এল। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়ে থাকে তা'ই হ'ল, অর্থাৎ—ঐ একই পরীক্ষার সতর্ক পুনরাবৃত্তি হ'ল। এন্রিকো ফের্মি ইতিমধ্যে তাঁর স্বদেশ ফ্যাসিস্ট্ ইতালি ছেড়ে আমেরিকাতে আশ্রয় নিয়েছেন, এবং বিভাজনের ঘটনাকে পরীক্ষা করছেন গভীরভাবে। মূলত তাঁর এবং লিও জিলার্ড (Leo Szilard)-এর

গবেষণায় আর এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার হল : ইউরেনিয়ামের বিভাজনে শুধুই দু'টো মাঝারি আকারের পরমাণু সৃষ্টি হয়—এমন নয় ; সেই সঙ্গে বা'র হয় দু'-তিনটি নিউট্রন। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সীমাহীন। কারণ, এই নিউট্রনগুলো হয়তো আবার অন্য দু'-তিনটি ইউরেনিয়াম পরমাণু-কেন্দ্রের বিভাজন ঘটাতে পারে ; তারপরে সেখান থেকে আরও নিউট্রন বা'র হয়ে আরও নতুন বিভাজন ঘটাবে,…এইভাবে ঘটনাটি আপনা থেকেই ঘটা সম্ভব ক্রমস্ফীত মাত্রাতে। এই সময়কার প্রত্যেকটি দিনের ইতিহাসই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং উত্তেজনাময়। কিন্তু, খুঁটিনাটি ঘটনার ভিতরে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এই সময়ে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সেও মূল্যবান গবেষণা হচ্ছিল, পরবর্তী সময়ে ( অর্থাৎ, পরমাণু-বোমা তৈরির সময়ে ) যা যথেষ্ট কাজে লেগেছিল।

'পরমাণু-বোমা' তৈরির বাস্তব সম্ভাবনার কথা ঠিক এই সময় থেকেই ভাবা শুরু হয়। বিজ্ঞানগত কৌতূহলের আকর্ষণ, মানুষের অস্তিত্বলোপের আশংকার বিকর্ষণ, সবই বিজ্ঞানীর ভিতরে একযোগে কাজ করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও এই সময়ে নিশ্চিত সম্ভাবনার রূপ নেয়। ইউরোপ থেকে আমেরিকাতে আশ্রয়-পাওয়া কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ( লিও জিলার্ড, ইউজিন্ ভিগ্নার, এডোয়ার্ড টেলার, এন্রিকো ফের্মি ইত্যাদি ) এই সময়ে মার্কিন সরকারকে তাঁদের আশংকার কথা জানাতে চেষ্টা করেন, এবং বিভাজনঘটিত গবেষণার তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল আর যাতে কোনো পত্রিকায় প্রকাশ না পায়, সেই ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হন। প্রথম প্রচেষ্টার ফলাফল কী দাঁড়ায়, তা' তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা যাবে, এবং দ্বিতীয় প্রচেষ্টার কার্যকর ফল পেতে আরও ছ'-সাত মাস লেগে যায়।

এই সময়ে নীল্স্ বোর্ এবং জন্ হুইলার (John A. Wheeler), এবং রাশিয়াতে ফ্রেঙ্কেল্ (Ya I. Frenkel) পরমাণু-কেন্দ্রকে একটি 'তরল-বিন্দু' হিসেবে গণ্য ক'রে বিভাজনের পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক রূপ গঠনের চেষ্টা করেন এবং যথেষ্ট সফল হন। যদিও এই কেন্দ্রকীয় তরলের ঘনত্ব এমন অবিশ্বাস্য রকমের বেশী—যা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় ভাবাই যায় না ; কিন্তু, তবু এর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের পরিচিত তরলেরই মতো। ইউরেনিয়ামের মতো বড় পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা যেহেতু বেশী, তা'ই এদের পারস্পরিক বৈদ্যুতিক বিকর্ষণে ঐ কেন্দ্রের সাংগঠনিক শ্লথতা আসা অনিবার্য, এবং এ অবস্থায় একটি নিউট্রনের সামান্য আঘাতেই ঐ তরল-বিন্দুতে যে তরঙ্গ জাগে তা'র ক্ষোভ সহ্য করা বিন্দুটির পক্ষে সম্ভব হয় না ; এবং এর ফলেই সে খণ্ডিত হয়। মোটামুটি এই ধারণাকেই গাণিতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন বোর্ ও হুইলার্,

এবং ফ্রেঙ্কেল্। বোর্ ও হুইলারের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 1939 সালের সেপ্টেম্বরে। পরমাণু-বোমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনো বিষয়ে এটিই সর্বশেষ প্রকাশিত প্রবন্ধ। গোপনীয়তা রক্ষার প্রচণ্ড হিড়িক প'ড়ে যায় এর পর থেকেই, এবং সেই ঐতিহ্য আজও বজায় আছে।

এর পরে বেশ কিছু সময় কেটে যায় বিভাজনের এবং নিউট্রনের চরিত্রের অন্যান্য নানা দিক পর্যবেক্ষণে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সময়ে জানা যায়। প্রথমত, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম নিয়ে বিভাজনের যে সব পরীক্ষা চালানো হচ্ছিল, তাতে কার্যত বিভাজন হচ্ছিল কেবল বিরল $U^{235}$-পরমাণুর; এর 139 গুণ সংখ্যাধিক্যে হাজির $U^{238}$-এর বিভাজন হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, $U^{235}$-এর বিভাজন তীব্রগতি নিউট্রনের সাহায্যেই ঘটানো শক্ত; শ্লথগতি নিউট্রনের পক্ষেই এ কাজ সহজ।

পরবর্তী গবেষণার ধারা অগ্রসর হচ্ছিল পারমাণবিক শক্তির 'সংযত প্রকাশ' (controlled liberation) লক্ষ করেই। তখন পর্যন্ত পরমাণু-বোমা তৈরির বাস্তব পরিকল্পনা কোথাও নেওয়া হয়নি,—যদিও সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিজ্ঞানীর মাথাতেই ঐ চিন্তা ক্রমাগত যাতায়াত করছিল, তা'তেও কোনো সন্দেহ নেই। পরমাণু-শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ যেহেতু এই পুস্তিকার আলোচনাগত নয়, তা'ই এ বিষয়ে আমরা বেশী অগ্রসর হব না। বরং সার্বিকভাবে উল্লিখিত বিভাজনধারাটি আমরা পরীক্ষা করব। ধ'রে নেওয়া যাক, $U^{235}$-এর একটি গোলাকার পিণ্ড নেওয়া হ'ল এবং বাইরে থেকে নিউট্রনবৃষ্টির ফলে ঐ পিণ্ডের একটি বা কয়েকটি ইউরেনিয়ামের বিভাজন হ'ল। এর ফলে যে সব নতুন নিউট্রনের জন্ম হ'ল, তা'রা দ্রুতগতি নিউট্রন। কিন্তু, এরা প্রত্যেকেই আবার এক-একটি ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকে আঘাত করতে পারবে, সে সম্ভাবনা কতখানি? আমরা আগেই বলেছি—একটি পরমাণুর পূর্ণ আয়তনের তুলনায় তা'র কেন্দ্রটি অতি ক্ষুদ্র, যা'র ফলে পরমাণুর অধিকাংশ অঞ্চলই ফাঁকা। অতএব, সদ্যোজাত নিউট্রন ফাঁকা জায়গার মধ্য দিয়েই অনেক দূর ছুটে যাবে, এবং হয়তো ঐ গোলাটির বাইরেই বেরিয়ে যাবে। একবার যদি নিউট্রন বাইরে চ'লে যায়, তবে সে আর কোনো কাজে লাগে না। এভাবে যদি বহু নিউট্রনই বাইরে চ'লে যায়, তবে ঈপ্সিত ধারাবাহিক বিভাজনটি হয়তো সম্ভবই হবে না। ক্রিয়াটি একবার শুরু ক'রে দিলেও খুব তাড়াতাড়ি থেমে যাবে। অতএব, ইউরেনিয়ামের ঐ গোলাটি খুব ছোট হ'লে চলবে না; তা'র একটা ন্যূনতম পরিমাণ অবশ্য প্রয়োজন, যা'র ফলে বিভাজনজাত নিউট্রনগুলোর অধিকাংশই বাইরে চ'লে না-গিয়ে আবার অন্য পরমাণু-কেন্দ্রের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আরও বিভাজন ঘটাতে পারে এবং ক্রমস্ফীত বিভাজনধারা

সুনিশ্চিত হয়। পারমাণবিক বোমা তৈরীর জন্য বিভাজনসাধ্য (fissile) বস্তুর ঐ ন্যূনতম পরিমাণকে 'সংকট পরিমাণ' (critical mass) বলা হয়। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র পরিমাণের উপরেই ঘটনাটি নির্ভরশীল হ'তে পারে না; জ্যামিতিক আকারের প্রশ্নটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হ'তে বাধ্য। আমরা ধ'রে নিয়েছি —বস্তুটিকে গোলাকার পিণ্ডের আকারে নেওয়া হচ্ছে। [ যদি $U^{235}$-কে পাতলা চাদরের আকার দেওয়া হয় ( টিনের পাতের মত ), তবে অপরিমিত বস্তু থাকলেও বিভাজনধারা ঘটবে না। কারণ, এক্ষেত্রে প্রায় সব নিউট্রনই শূন্যে হারিয়ে যাবে, —যে ছবিটি আমরা সহজেই কল্পনা ক'রে নিতে পারি। ] একটি মার্কিন হিসেব অনুযায়ী, বিশুদ্ধ $U^{235}$-এর 'সংকট পরিমাণ' হয় 47 কিলোগ্রাম। তবে অজস্র ছোট-বড় বিষয়ের উপরে এই পরিমাণ কার্যত নির্ভর করে। পরমাণু-বোমার গঠন কৌশলে এই পরিমাণ অনেক কমিয়ে ফেলা যায়। অবশ্য, বাস্তবে পরমাণু-বোমাতে সংকট-পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে $U^{235}$ ( বা উপযুক্ত অন্য বস্তু ) ব্যবহার করা হয়।

আমরা বলেছিলাম—একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনে দু'টি বা তিনটি নিউট্রন বা'র হয়। $U^{235}$-এর ক্ষেত্রে এর সঠিক গড়পড়তা হিসেব দাঁড়ায় 2·45, যখন শ্লথগতি নিউট্রনের আঘাতে বিভাজন হয়। তীব্রগতি নিউট্রনের ক্ষেত্রে বিভাজনের সম্ভাবনা [ $U^{235}$-এর ক্ষেত্রে ] কম হ'লেও ঐ সংখ্যা কিন্তু বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় 2·65। ইউরেনিয়াম বাদে যদি অন্য কোনো বিভাজনসাধ্য বস্তু ব্যবহার করা হয়, যা' থেকে আরও বেশী নিউট্রন বা'র হ'তে পারে—তবে বোমা তৈরির পক্ষে সে হবে আরও মূল্যবান, এবং তার 'সংকট পরিমাণ' আরও কম হবে। এই রকম একটি বস্তু 'প্লুটোনিয়াম'—যা'র কথা আমরা পরে বলব।

### পা র মা ণ বি ক মু হূ র্ত

ইউরেনিয়াম-235-এর একটি গোলাতে বিভাজন শুরু হয়ে সম্পূর্ণ গোলাটি শেষ হ'তে কতক্ষণ লাগে? আমরা ব্যবহারিক জীবনে অনেক সময়ে 'মুহূর্তমধ্যে' কথাটি ব্যবহার ক'রে থাকি; কিন্তু, বিভাজনধারার দ্রুততার তুলনায় আমাদের জীবনের ঘটনাগত মুহূর্তকে একটা মহাযুগও বলা যায়, মানবিক মুহূর্তের তুলনায় পারমাণবিক মুহূর্ত এতই ছোট হ'তে পারে। এ সম্পর্কে একটি চিত্তা-কর্ষক হিসেব এখানে দাখিল করা সম্ভব।

প্রথমেই বলা চলে: বিভাজনের ফলে যে নিউট্রনের উৎপত্তি হয় তা এতই দ্রুত হয়, যে ঐ দু'টি ঘটনাকে কার্যত সমাপতিত ব'লে মনে করা যায়। আসলে ঐ মধ্যবর্তী বিলম্বটুকু হ'ল $10^{-15}$ সেকেণ্ড ( অর্থাৎ দশমিকের পরে চৌদ্দটি শূন্য

বসিয়ে 1 লিখতে হবে)। একটি নিউট্রন জন্মানোর পরে তা'র সাহায্যে বিভাজনজাত পরবর্তী নিউট্রনের জন্ম হ'তে যে সময় লাগে, তা'কে নিউট্রনের এক 'প্রজন্মকাল' (generation-time) বলে। এক তাল ইউরেনিয়ামের গোলাতে একটি 'প্রজন্ম' মোটামুটি 0·00000001 থেকে 0·0000001 সেকেন্ড সময় নিয়ে থাকে। তা'হলে আশি প্রজন্মের 'সময়কাল' দাঁড়ায় 0·0000008 থেকে 0·000008 সেকেন্ড। এই আশি প্রজন্মে মোট কতগুলো ইউরেনিয়াম-পরমাণুর বিভাজন হয়? ধরা যাক, একটিমাত্র পরমাণুর বিভাজন দিয়েই ঘটনার শুরু হয়; প্রতি বিভাজনে মাত্র দু'টি নিউট্রন বা'র হয়, এবং প্রত্যেকটি নিউট্রনই বিভাজন ঘটায়। তা'হলে প্রথম বিভাজনে দু'টি নিউট্রন বা'র হয়, দ্বিতীয় বিভাজনে (প্রথম প্রজন্মের শেষে) চারটি নিউট্রন বা'র হয়, দ্বিতীয় প্রজন্মের শেষে আটটি নিউট্রন বা'র হয়,... ইত্যাদি। এ ভাবে প্রথম আশি প্রজন্মের হিসেবেই দেখা যায়—মোট $10^{24}$ (একের পিঠে চব্বিশটি শূন্য) পরমাণুর বিভাজন হয়, যা'র ওজন প্রায় 400 গ্রাম এবং যা'র বিভাজনে 30,000,000,000 কিলোওয়াট শক্তি মুক্ত হয় (এক হাজার টন তেল পুড়লে যা'র সমান হ'তে পারে)। আমরা যেন ভুলে না-যাই—এই শক্তির প্রকাশ হয়েছে মাত্র 0·0000008 থেকে 0·000008 সেকেন্ডের মধ্যে, যে সময়ে অত ছোট্ট জায়গার ভিতরে এক হাজার টন তেল পোড়ানো অসম্ভব।

প্রথম আশি প্রজন্মের পর থেকে প্রত্যেকটি প্রজন্ম অত্যন্ত মূল্যবান; কারণ, কেবল একাশিতম প্রজন্মেই প্রায় 800 গ্রাম ইউরেনিয়ামের বিভাজন হবে; বিরাশিতম প্রজন্মে দেড় কিলোগ্রামের। পরমাণু-বোমার ক্ষেত্রে এই সময়কার কয়েকটি প্রজন্মই ঐ অস্ত্রের যথার্থ কার্যকারিতা নির্দেশ করে, এবং বোমাটির গঠনে এমন নৈপুণ্যে থাকা দরকার যা'তে বিভাজনধারা ওর আগেই শেষ হয়ে না-যায়। কারণ, প্রথম আশি প্রজন্মের আগেই ক্ষুদ্র আয়তনে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তা'তে অবশিষ্ট ইউরেনিয়াম বাষ্পে পরিণত হয় এবং তা' দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে চেষ্টা করে। অবশ্য, যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আলোচিত বিভাজনধারা অগ্রসর হয়, সেই দ্রুততায় ইউরেনিয়াম বাষ্পের প্রসারণ হ'লে তবেই এখানে তা'র উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। কিন্তু, বাস্তবে তা'ও সম্ভব। বিস্ফোরণ-কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ যখন হঠাৎ দাঁড়ায় প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রায় এক কোটি টন, তখন ঐ অঞ্চলের সমস্ত বস্তু-কণার গতিবেগ সেকেন্ডে কয়েক হাজার মাইল হওয়া অসম্ভব নয়, যা'র ফলে ইউরেনিয়াম-বাষ্পের প্রসারণ সব দিকেই এক ফুট অবধি হ'তে পারে মাত্র 0·0000001 সেকেন্ডের ভিতরে। এই প্রসারণ যদি সত্যিই ঘটে, তবে বিভাজনধারা এখানেই কার্যত শেষ হয়। কারণ, ইউরেনিয়াম অত্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার দরুন সদ্যোজাত নিউট্রনের সঙ্গে তা'র কেন্দ্রের সংঘাতের সম্ভাবনা কমে, এবং অধিকাংশ নিউট্রন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাইরে ছিটকে

চ'লে যাওয়ায় বিভাজনধারা আর বিশেষ অগ্রসর হ'তে পারে না। এ অবস্থায় পরমাণু বোমার ধ্বংসক্রিয়া আশানুরূপ হয় না, যেহেতু অল্প পরিমাণ ইউরেনিয়ামের সার্থক ব্যবহার হয়। সুতরাং, পরমাণু-বোমার নির্মাতারা চেষ্টা করেন যা'তে ঐ প্রসারণ যতক্ষণ সম্ভব ঠেকিয়ে রাখা যায়। এর জন্য ইউরেনিয়ামের একটি সুকঠিন আধার ('tamper') থাকে, যা'র দেয়ালে প্রসারণোন্মুখ ইউরেনিয়াম-বাষ্প বাধা পায় এবং বহির্গামী নিউট্রনগুলোও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে*। এর ফলে বিস্ফোরণের তীব্রতা অনেক বাড়ে (এবং শেষ পর্যন্ত ঐ 'আধার'ও বাষ্পীভূত হয়)। অবশ্য, তা' সত্ত্বেও একেবারে সম্পূর্ণ ইউরেনিয়ামের সদ্ব্যবহার (!) সম্ভব হয় না, এবং প্রসারণজনিত কারণেই শেষ অবধি বিভাজন-ধারার সমাপ্তি হয়।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা এখানে বলা যায়। আমরা লক্ষ করেছি, এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়ামের বিভাজন হ'তে মোটামুটি 0·00001 সেকেণ্ড সময় লাগে। তা'হলে এক সেকেণ্ডে এই ধারা কতদূর অগ্রসর হ'তে পারে? হিসেব করলে দেখা যায়ঃ আমাদের পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই যদি $U^{235}$ হয়, এবং তা' যদি একত্র ক'রে নির্বাধ বিভাজনধারা চালানো হয়, তবেও ঐ ধারা দীর্ঘ 1 সেকেণ্ড ধ'রে অগ্রসর হ'তে পারে না। তা'র আগেই সমস্ত পদার্থের বিভাজন হয়ে যায়।......এই আলোচনায় আমরা পরমাণু-বোমায় পারমাণবিক ক্রিয়ার দ্রুততা সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, পরমাণু-বোমার উগ্র, বিধ্বংসী ক্রিয়ার মূল কারণই ঐ দ্রুততা—যা'র ফলে অত্যন্ত অকস্মাৎ প্রচণ্ড চাপ এবং উত্তাপের জন্ম হয়। এর পরিণতি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

### প্লু টো নি য়া ম

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের প্রায় সবটাই (শতকরা 99·3 ভাগ) $U^{238}$, যা' বিভাজনের পক্ষে কম উপযোগী। বিশেষত, শ্লথগতি নিউট্রনের সঙ্গে $U^{238}$ কেন্দ্রের সংঘাতে 'বিভাজন' হয় না; নিউট্রনটি তা'র লক্ষ্যের সঙ্গে সংলগ্ন হয়। এ ক্ষেত্রে নিউট্রন-বিদ্ধ পরমাণুটিরও 'ইউরেনিয়াম' পরিচিতি অক্ষুণ্ণ থাকে, যেহেতু প্রোটনের সংখ্যার পরিবর্তন হয় না। এই নবলব্ধ $U^{239}$ দ্রুত তেজস্ক্রিয়ায় 'নেপ্‌চুনিয়াম্'-এ পরিণত হয়, এবং নেপ্‌চুনিয়াম্-ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণে 'প্লুটোনিয়াম্'-এ পরিণত হয়। প্লুটোনিয়ামও তেজস্ক্রিয়; কিন্তু তা'র অর্ধায়ু অতি দীর্ঘ (24000

* কোনো একটি ক্ষেত্রে 'tamper' হিসেবে এক ইঞ্চি পুরু $U^{238}$-ধাতুর পাতের আধার ব্যবহৃত হয়েছিল। এক থেকে দু' ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের আধারও কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ব'লে জানা যায়।

বছর) ; সুতরাং সংরক্ষণযোগ্য। [ প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ঃ ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী পরমাণু গঠনের যে ব্যাপক এবং ব্যর্থ চেষ্টায় 'বিভাজন'-এর অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার হয়েছিল (1938), নেপ্‌চুনিয়াম্ হ'ল সেই উদ্যোগেরই সার্থক সৃষ্টি (1940)। ] এই প্লুটোনিয়াম পরমাণু-বোমা তৈরির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী, এমনকি $U^{235}$-এর চেয়েও। এর কারণ দু'টো ঃ প্রথমত প্লুটোনিয়ামের বিভাজনে বেশী নিউট্রন বা'র হয় ( প্রতি বিভাজনে গড়পড়তা প্রায় তিনটি ), এবং দ্বিতীয়ত, শ্লথগতি নিউট্রন এবং দ্রুতগতি নিউট্রন, দুয়ের সাহায্যেই স্বচ্ছন্দে প্লুটোনিয়ামের বিভাজন হ'তে পারে। প্রথমোক্ত কারণে প্লুটোনিয়ামের সংকট-পরিমাণ কম ; অতএব, অল্প পরিমাণ ব্যবহারেই যথেষ্ট কাজ হয়। কিন্তু, প্লুটোনিয়ামের বিশেষ অসুবিধা হ'ল তা'কে নিয়ে নাড়াচাড়া করা। বাতাসের সংস্পর্শে এতে আগুন ধ'রে যায়। বাস্তবে প্লুটোনিয়াম-বোমা ইউরেনিয়াম-বোমার চেয়ে কম 'জনপ্রিয়' নয়। নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমাটিও ছিল প্লুটোনিয়াম-বোমা।*

### বি স্ফো র ণে র শু রু

অন্য যে কোনো সাধারণ বোমা কিংবা বাজীর মত পরমাণু-বোমাতেও বিস্ফোরণটি ঘটাবার ( detonation-এর ) একটা উপায় থাকা দরকার ; নইলে তা'কে ইচ্ছামত ব্যবহার করাই যাবে না। কিন্তু, সাধারণ বোমা বা পট্‌কার ক্ষেত্রে এই সমস্যা কারিগরকে আদৌ বিব্রত করে না ; কিন্তু, প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পরমাণু-বোমার ক্ষেত্রে। বস্তুত, নীতির দিক থেকে নিতান্ত সরল হয়েও পরমাণু-বোমার রূপায়ণ বাস্তবে দুরূহ হয় যে দু'টি কারণে, তা'র একটি হ'ল বিভাজনসাধ্য বস্তুটিকে বিশুদ্ধ রূপে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া, এবং অন্যটি হ'ল—বিস্ফোরণ শুরু করার উপযুক্ত কৌশল আয়ত্ত করা। দ্বিতীয় সমস্যাটি কেন জটিল, তা' এবারে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

আমরা জানতে পেরেছি—বিভাজনসাধ্য বস্তুটি একটি ন্যূনতম পরিমাণে একত্রে থাকলেই একটি ক্রমস্ফীত বিভাজনধারা ( অর্থাৎ, বিস্ফোরণ ) প্রতিষ্ঠিত হবে, যদি বিভাজন-ক্রিয়াটি কোনোমতে একবার শুরু ক'রে দেওয়া যায়। ঐ ন্যূনতম পরিমাণকেই আমরা বলেছি 'সংকট-পরিমাণ'—যা' নির্ভর করে ঐ বিশেষ বস্তুটির

---

* ইউরেনিয়াম-235 এবং প্লুটোনিয়াম-239 বাদেও আর একটি বিভাজনসাধ্য বস্তু হ'ল ইউরেনিয়াম-233। থোরিয়ামকে নিউট্রনের আঘাত দিয়ে ঐ বস্তুটি তৈরি করা যায় ; কিন্তু, কারিগরী জটিলতা এবং ব্যয়বহুলতার জন্য বাস্তবে $U^{233}$-র ব্যবহার নেই। এই পুস্তিকায় $U^{233}$ নিয়ে আমরাও কোনো আলোচনা করিনি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, থোরিয়ামের সবচেয়ে বড় উৎস হ'ল ভারত। কিন্তু, উল্লিখিত অসুবিধার জন্য থোরিয়ামকে ভারতও পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারেনি।

উপর এবং তা'কে যে জ্যামিতিক আকার দেওয়া হবে—তা'র উপর ( গোলাকার পিণ্ড হিসেবেই নেওয়া সুবিধাজনক )। ক্রিয়াটি শুরু করার জন্য অবশ্যই নিউট্রনের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস চাই। তেমন উৎস বিরল নয় ; কিন্তু, সমস্যা দেখা দেয় অন্যত্র। বাস্তবে বোমার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া তীব্র ও সুনিশ্চিত করবার জন্য ইউরেনিয়াম ( বা প্লুটোনিয়াম ) সঙ্কট-পরিমাণের চেয়ে যথেষ্ট বেশী নেওয়া হয় ; কিন্তু, আগে থেকেই সম্পূর্ণ ইউরেনিয়ামকে একত্র ক'রে রাখা যায় না। কারণ, ঐ পিণ্ডতে সংকট পরিমাণের চেয়ে বেশী ইউরেনিয়াম থাকলেই যে কোনো মুহূর্তে বোমার ক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে—নিউট্রন দিয়ে ত'াকে আঘাত না করলেও। ঈপ্সিত মুহূর্তের আগেই বিস্ফোরণ ঘটা বা pre-detonation-এর অনেক কারণ থাকতে পারে। একটি কারণ হ'ল মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic rays)। সৌরমণ্ডলের বাইরে থেকে যে সব সূক্ষ্ম কণিকা নিরন্তর পৃথিবীর উপরে এসে পড়ে, তা'দের ভিতরে কিছু নিউট্রনও থাকে, যা'র সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গফুটে প্রায় বারোটি। এরা যে কেউ ঐ ইউরেনিয়ামের গোলাতে আঘাত ক'রে বিস্ফোরণটি মুহূর্তে শুরু এবং শেষ ক'রে দিতে পারে। দ্বিতীয় ভূতটি আছে সর্ষের ভিতরেই। ইউরেনিয়াম নিজেই তেজস্ক্রিয় ; যদিও এর অর্ধায়ু অতি দীর্ঘ (সত্তর কোটি বছর !) ব'লে দ্রুত নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা নেই। ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র তেজস্ক্রিয়ার ফলে আল্‌ফা-কণিকা বিকিরণ করে এবং নিজে থোরিয়াম-এ পরিণত হয়। এতে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু, 1940 সালে দু'জন রুশ বিজ্ঞানী (G.N. Flerov এবং K.A. Petrzhak) লক্ষ করেন—মাঝে মাঝে এক-একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর 'স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন' (spontaneous fission) হয়—বাইরের প্ররোচনা ( নিউট্রনের আঘাত ) ছাড়াই। এই ঘটনা ইউরেনিয়ামের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার তুলনায় অতি বিরল ; বহু কোটি ইউরেনিয়াম-পরমাণু স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়ায় যতক্ষণে ভাঙে, ততক্ষণে হয়তো একটিমাত্র পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন হয়। কিন্তু, যেখানে একত্রে কার্যত অসংখ্য পরমাণুর উপস্থিতি, সেখানে এই বিরল ঘটনাকেও গ্রাহ্য করতে হয়। মাত্র এক গ্রাম ইউরেনিয়ামে $10^{21}$-এর বেশী পরমাণু থাকে। কয়েক কিলোগ্রামের ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যা আরও ভীতিকর হবে সন্দেহ নেই। পূর্বোক্ত রুশ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পান—এক গ্রাম ইউরেনিয়ামে প্রতি একশো সেকেণ্ডে একটি পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন হয়। অতএব, কয়েক কিলোগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতি সেকেণ্ডে একাধিক বিভাজন হয়ে যাবেই। বিভাজন হ'লেই তীব্রগতি নিউট্রন একাধিক জন্ম নেবে। এর যে কোনোটিই পরমাণু-বোমাকে অস্থানে, অসময়ে কার্যকর ক'রে তুলতে পারে। এই দু'টি ছাড়াও তৃতীয় কারণ হ'তে পারে পারমাণবিক সংঘাত-ক্রিয়াজনিত। ইউরেনিয়াম পিণ্ডটি নিশ্চয়ই একটি

ধাতব পাত্রে রাখা থাকবে। কিছু সংখ্যক ইউরেনিয়াম-পরমাণু থেকে নিঃসৃত আলফা-কণিকা ঐ ধাতুকে আঘাত করার ফলে কোনো কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বস্তু সৃষ্টি হ'তে পারে—যা' থেকে নিউট্রনের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। ধাতুটি সযত্ন নির্বাচিত হলেও তা'র সামান্য অশুদ্ধি থেকেই এটা ঘটতে পারে।…মূলত প্রথম দু'টি কারণে পরমাণু-বোমাতে আকাঙ্ক্ষিতপূর্ব বিস্ফোরণ অনায়াসে ঘটা সম্ভব। অতএব, ইউরেনিয়ামের গৃহীত পরিমাণটি আগে থেকেই একটি পিণ্ডাকারে রাখা যাবে না; তা'কে অন্তত দু'টি খণ্ডে আলাদা ক'রে রাখতে হবে—যার প্রতিটি খণ্ডের পরিমাণ হবে সংকট-পরিমাণের চেয়ে কম। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বোঝা গিয়েছে—এ রকম একটি খণ্ডে বিভাজন শুরু হলেও নিউট্রনের অতিরিক্ত ক্ষরণের ( leakage-এর ) জন্য তা' ধারাবাহিকভাবে তেমন অগ্রসর হ'তে পারে না। সুতরাং বিপদের সম্ভাবনাও কিছু নেই।

মূল সমস্যাটি এইবারে দেখা দেয়। সমস্যাটি হ'ল—খণ্ড দু'টি একত্র করার সমস্যা। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশলে এদের একত্র করতে হবে। কিন্তু, যখনই খণ্ড দু'টি পরস্পরে কাছাকাছি এসে যাবে, তখনই একটি খণ্ড থেকে নিঃসৃত কিছু নিউট্রন অন্যটিতে ঢোকবার সুযোগ পাবে। এইভাবে, খণ্ড দু'টি সঠিক সংলগ্ন হবার আগেই দ্রুতগতি নিউট্রনের মাধ্যমে তাদের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ক্রমস্ফীত বিভাজনধারা শুরু হয়ে যাবে—যদিও আকাঙ্ক্ষিত তীব্রতায় নয়; কারণ খণ্ড দু'টি সঠিক একত্রিত না-হওয়া পর্যন্ত বহু সংখ্যক নিউট্রনের অপচয় ( ক্ষরণ ) হয়েছে। যতক্ষণে খণ্ড দুটি সঠিক একত্রিত হবে, ততক্ষণে দ্রুতগতি বিভাজনধারা কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু, পূর্ণ তীব্রতায় তা'র স্ফুরণ কখনই হয় নি। অথচ, খণ্ড দু'টি সঠিক একত্র না-হওয়া পর্যন্ত বিভাজনধারা শুরু করা হবে **না**—এমন ব্যবস্থাও করা অসম্ভব। বন্দুক বা কামানের মত এ ক্ষেত্রে আলাদা 'ট্রিগার' কিছুই নেই; যথেষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম একত্রে উপযুক্ত আকারে থাকলেই বিস্ফোরণ হয়ে যাবে, যদিও তা'র তীব্রতার কম-বেশী হ'তে পারে অবস্থা অনুসারে। সুতরাং, এটাই হচ্ছে সমস্যা। পরমাণু-বোমার সজ্জাটিকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করবার আগেই ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, এবং সেই ক্রিয়া যথেষ্ট তীব্র না-হওয়ায় বিস্ফোরণটি সাধারণ বোমার বিস্ফোরণের তুল্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই সমস্যার তাত্ত্বিক সমাধান হ'ল—খণ্ড দুটিকে অতি দ্রুত একত্র করা। সাধারণ একটি বিস্ফোরণের সাহায্যে একটি খণ্ডকে কামানের গোলার মত অন্য খণ্ডটির উপর ফেলা চলে; কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও বাস্তব চিত্রটি খেয়াল করা দরকার। কামানের দ্রুততম গোলার পক্ষে হয়তো সেকেণ্ডে চার-পাঁচ মাইল অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ইউরেনিয়ামের গোলা দু'টিকে প্রাথমিকভাবে ছ' ইঞ্চি থেকে এক ফুট

তফাতে রাখতে হবেই। উল্লিখিত বেগে ঐ দূরত্ব যেতে সময় লাগে মোটামুটি 0·00005 সেকেণ্ড। কিন্তু, আগেকার আলোচনায় আমরা দেখেছি, বিভাজন-ধারাটি এর প্রায় একশো গুণ দ্রুততায় সমাপ্ত হ'তে পারে। অর্থাৎ, বিস্ফোরণ-ক্রিয়ার দ্রুততার তুলনায় খণ্ড দু'টি একত্র করার গতি নিতান্তই মন্থর। এর ফলে বিস্ফোরণ-ক্রিয়া (বা বিভাজনধারা) অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দীর্ঘায়িত হবে, এবং ফলত তা'র তীব্রতা হবে অনেক কম।

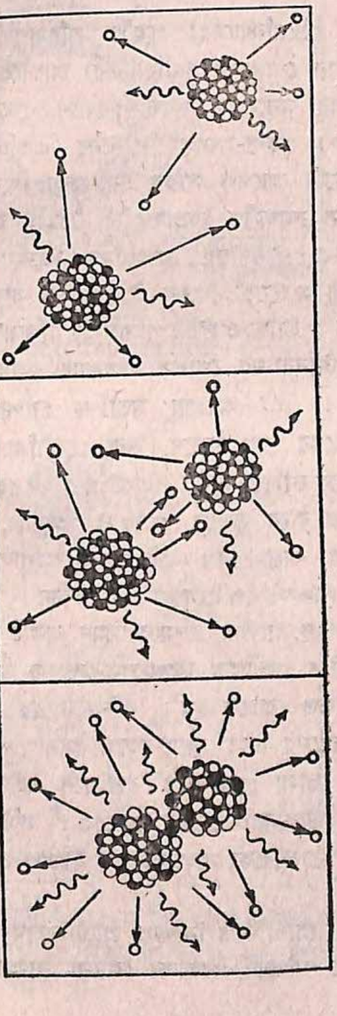
এখানে আমাদের আলোচনাটি অবশ্য কিছুটা হতাশাবাদী আলোচনা। খণ্ড দু'টি নিকটতর হবার সামান্য সময়ের ভিতরে স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন না-ও হ'তে পারে, কিংবা অন্য কোনো কারণে নিউট্রনের অনুপ্রবেশ না-ও ঘটতে পারে, অথবা যে অতি স্বল্পসংখ্যক নিউট্রন একটি খণ্ড থেকে অন্যটিতে যাবে, তা'রা হয়তো কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না; কারণ, বাস্তবে সব ক'টি নিউট্রনই লক্ষ্যভেদ করে, এমন নয়। কিন্তু খানিকটা অনিশ্চয়তা রয়েই যায়। শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার বাস্তব সমাধান কিছু হয়েছিল কি না, সে সম্পর্কে প্রকাশিত কোনো আলোচনা নেই। তবে, তেমন ভালো সমাধান বোধহয় কিছুই পাওয়া যায় নি। পরমাণু-বোমার একজন নির্মাতা স্পষ্টই বলেছেন—অপরিণত বিস্ফোরণ (অর্থাৎ, খণ্ড দু'টি সঠিক একত্রিত হবার আগেই বিস্ফোরণের সূচনা) কপাল-জোরে ছাড়া ঠেকানো অসম্ভব। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি খণ্ড দু'টিকে দ্রুততম গতিতে সংযুক্ত করার। এটাই একমাত্র সমাধান। হয়তো শতকরা এক ভাগ সম্ভাবনা আছে অপরিণত বিস্ফোরণের; কিন্তু, এটুকু জুয়া খেলতেই হবে। কোনো সামরিক অভিযানেই সাফল্যের সম্ভাবনা এর চেয়ে বেশী হয় না।......

আলোচিত উপায়ে, অর্থাৎ—একটি ইউরেনিয়াম-খণ্ডকে অন্যটির উপরে নিক্ষেপে, বিস্ফোরণ ঘটানোর পদ্ধতিকে বলা হয় 'বন্দুক-প্রণালী'(gun-method)। হিরোশিমাতে নিক্ষিপ্ত বোমাটি এই ভাবেই কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু, আলোচিত অসুবিধার জন্য পদ্ধতিটি ক্রমশ অনাদৃত হয়, এবং এখন সম্ভবত ব্যবহৃত হয় না।

'বন্দুক-প্রণালী' প্লুটোনিয়াম-বোমার ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারেই অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য পদ্ধতিতে হ'লেও বাস্তবে $U^{235}$-কে প্রায় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পাওয়া যায়; কিন্তু, $Pu^{239}$-কে খুব বিশুদ্ধতায় পাওয়া অসম্ভব। অশুদ্ধি হিসেবে এর ভিতরে থাকে $Pu^{240}$ এবং প্লুটোনিয়ামের এই অবাঞ্ছিত রূপটি বাস্তবে অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হয়; কারণ—এর স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজন হয়। এর ফলে প্লুটোনিয়ামের একটি গোলায় স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজনের হার $U^{235}$-এর অনুরূপ একটি গোলার তুলনায় অনেক বেশী। বন্দুক-প্রণালীতে

দু'টি খণ্ড সংযুক্ত করতে যে সামান্য সময়টুকু দরকার, ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে তা' চলতেও পারে ; কিন্তু, প্লুটোনিয়ামের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল। ঐ সামান্য সময়ের ভিতরেই একাধিক স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজনের সম্ভাবনা অপরিণত বিস্ফোরণকে প্রায় নিশ্চিত ক'রে তোলে।

1944 সালের মাঝামাঝি সময়ে, আমেরিকাতে প্রথম পরমাণু-বোমা তৈরির



ইউরেনিয়াম-235-এর দু'টি খণ্ড। প্রত্যেকটির পরিমাণ সঙ্কট পরিমাণের চেয়ে কম। দু'টিতেই 'বিভাজন' হয়ে চলেছে বিক্ষিপ্তভাবে ; কিন্তু, বিভাজন-জাত নিউট্রনের 'ক্ষয়' (loss) এক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশী। কারণ, একটি খণ্ড থেকে নির্গত নিউট্রনের অন্য খণ্ডে ঢোকবার সম্ভাবনা খুব কম।

খণ্ড দু'টি কাছাকাছি এসেছে। এবারে একটি থেকে নিঃসৃত বেশ কিছু নিউট্রন অন্যটিতে আঘাত করতে পারে। নিউট্রনের ক্ষয় এক্ষেত্রে আগের তুলনায় কম ; অর্থাৎ, ব্যবহৃত নিউট্রনের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। 'বিভাজনধারা' গ'ড়ে ওঠবার সম্ভাবনাও কিছু বেশী হল।

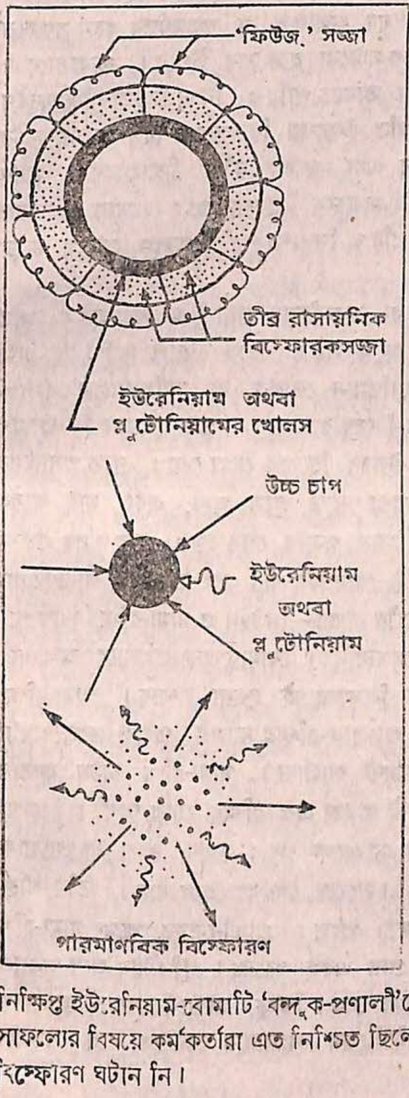
খণ্ড দু'টি সম্পূর্ণ একত্র হবার আগেই বিভাজনধারা গ'ড়ে উঠতে পারে। এটি বাঞ্ছনীয় নয়। এর ফলে বিস্ফোরণটি আকাঙ্ক্ষিত তীব্রতায় হবে না।

কাজকর্ম ('ম্যান্‌হাটান্‌ প্রোজেক্ট') যখন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল, তখন 'বন্দুক-প্রণালী'র একটি বিকল্প বিজ্ঞানীদের মাথায় আসে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা একেবারে নতুন পথে এগোতে থাকে। জটিলতর এই নতুন পদ্ধতিকে বাস্তবে নিখুঁত ক'রে তুলতে প্রচুর উদ্যমের প্রয়োজন হয়। একে বলা হয় 'কেন্দ্রমুখী বিস্ফোরণ' (implosion) পদ্ধতি। আমরা এখন এই জটিল পদ্ধতিটি বোঝবার চেষ্টা করব।

এ ক্ষেত্রে প্লুটোনিয়ামের (বা ইউরেনিয়ামের) গৃহীত পরিমাণটি একটি গোলকের আকারে না নিয়ে গোলাকার খোলসের (shell-এর) আকারে নেওয়া হয়। বিশেষ এই জ্যামিতিক আকার অনুসারে সংকট পরিমাণের চেয়ে অনেক কম প্লুটোনিয়াম নেওয়া হয়ে থাকে। কেন্দ্র-অঞ্চলে নিউট্রনের একটি উৎসও থাকতে পারে। এই উৎস যদি কিছুটা আগেও সক্রিয় হয়, তবু বিস্ফোরণের আশংকা নেই ; কারণ—এই অবস্থাতে ক্রমস্ফীত বিভাজনধারা তৈরীই হবে না। প্লুটোনিয়াম-খোলসের বাইরে অত্যন্ত উচ্চশক্তির রাসায়নিক বিস্ফোরকসজ্জা খোলসটিকে ঘিরে থাকে। নির্ধারিত মুহূর্তে বিশেষ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় ঐ বিস্ফোরককে একসঙ্গে বহু বিন্দুতে (শতাধিকও হ'তে পারে) 'জ্বালিয়ে' দেওয়া হয়। তীব্র বিস্ফোরণের চাপে প্লুটোনিয়ামের খোলস তৎক্ষণাৎ একটি কঠিন গোলকের আকারে কেন্দ্রীভূত হয়। এই অবস্থায় অত্যাধিক চাপের দরুন প্লুটোনিয়ামের ঘনত্ব দাঁড়ায় স্বাভাবিকের প্রায় দ্বিগুণ, এবং প্লুটোনিয়ামের ঐ গৃহীত পরিমাণই এখন সংকট-পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। (একই সঙ্গে, ঐ কেন্দ্রমুখী চাপ কেন্দ্রস্থ নিউট্রন-উৎসকেও সক্রিয় ক'রে তুলতে পারে।) অতএব, এবারে আকাঙ্ক্ষিত পরমাণু-বিস্ফোরণের বাধা থাকে না। এই পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে যতই সাধারণ মনে হোক, এর বাস্তব সাফল্যে পৌঁছোনো বেশ কঠিন। সাধারণ লেন্স্‌ বা আতস-কাচের সাহায্যে একগুচ্ছ আলোর রশ্মিকে যেমন একটি বিন্দুতে সংহত (focus) করা যায়, আলোচিত পদ্ধতিতে বিস্ফোরক-লেন্সের সাহায্যে সমস্ত প্লুটোনিয়ামকে তেমনি কেন্দ্রীভূত করতে হয়। কম্পিউটারের সাহায্যে জটিল বহু গাণিতিক সমস্যার সমাধানের এবং হাতে-কলমে অনেক পরীক্ষার সাহায্যে এই ব্যবস্থাকে নিখুঁত ক'রে তোলা প্রয়োজন। বর্তমানে এই পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, এমন কি—ইউরেনিয়াম-বোমার ক্ষেত্রেও। যদিও, এই পদ্ধতির সাফল্যের জন্য রাসায়নিক বিস্ফোরকের সাহায্যে বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় এক কোটি পাউন্ড চাপ সৃষ্টি করতে হয়।

কেন্দ্রমুখী বিস্ফোরণের সাহায্যে নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত প্লুটোনিয়াম-বোমাটি কার্যকর করা হয়েছিল। কিন্ত, এই অভিনব পদ্ধতির কোনো ব্যবহার এর

আগে না হওয়ায় মার্কিন কর্মকর্তারা নাগাসাকিতে এটি ব্যবহার করবার আগেই নিউ মেক্সিকোর মরু অঞ্চলে ঐ পদ্ধতিতে একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান 1945-এর 16ই জুলাই। এটিই পরমাণু-বোমার প্রথম বিস্ফোরণ। হিরোশিমাতে




অন্তর্মুখী বিস্ফোরণের সাহায্যে পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো।

নিক্ষিপ্ত ইউরেনিয়াম-বোমাটি 'বন্দুক-প্রণালী'তে কার্যকর করা হয়। এই প্রণালীর সাফল্যের বিষয়ে কর্মকর্তারা এত নিশ্চিত ছিলেন যে, এর জন্য কোনো পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটান নি।

### বি স্ফো র ণে র ফ ল

পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আমরা আলাদা পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। এখানে কেবল ক্ষয়ক্ষতির মূল কারণগুলো জেনে রাখা যাক। প্রথমেই অবশ্য বলা উচিত—বিস্ফোরণের ফলাফল বা ক্ষয়ক্ষতির ধরন সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে বিস্ফোরণটি কোথায় ঘটানো হবে তার উপরে। স্থূলভাবে এ ব্যাপারে মোট চারটি শ্রেণীর কথা আমরা ভাবতে পারি : নিম্ন উচ্চতায় বিস্ফোরণ (দশ হাজার ফুটের কম উচ্চতায়) ; অতি উচ্চতায় বিস্ফোরণ (দশ হাজার ফুটের বেশী উচ্চতায়) ; ভূ-গর্ভে বিস্ফোরণ এবং জলের নীচে বিস্ফোরণ। এদের ভিতরে সামরিক উপযোগিতায় প্রথমটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ; শেষোক্ত শ্রেণীরও কিছু ব্যবহার হওয়া একান্ত সম্ভব, যদিও নিতান্ত পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ছাড়া বাস্তবে এটা ঘটানো হয়নি।

পরমাণু-বোমার ক্ষতিকর ক্রিয়া বা ধ্বংসক্রিয়া নানা দিক থেকে হয়। অতি সামান্য পরিসরে এবং কল্পনাতীত ক্ষুদ্র সময়ে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়, এবং গ্যাসের (বাতাসের) একটি তীব্র দ্যুতিমান গোলক বা 'অগ্নিগোলক' (fire-ball) জন্ম নেয়। এই গোলক দ্রুত বিস্ফারিত হয়। পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণে মুক্ত শক্তির মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ উত্তাপ হিসেবে দেখা দেয়। দ্রুত প্রসারণের ফলে এই অগ্নিগোলকের উষ্ণতা অবশ্য দ্রুত হ্রাস পায়, এবং মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরেই এর ক্ষতিকর ক্রিয়ার ক্ষমতা শেষ হয়। কত দূরত্ব পর্যন্ত এর ক্রিয়া উল্লেখযোগ্য হবে, তা' অবশ্যই বোমাটির শক্তি এবং তখনকার আবহাওয়ার উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করে। দ্বিতীয় কারণ—নিউট্রন ও গামা-রশ্মির বিকিরণ। এই বিষয়ে পরমাণু-বোমা সাধারণ (রাসায়নিক) বোমা থেকে একেবারে আলাদা ; কারণ—এই ক্রিয়া কেবল পারমাণবিক বিস্ফোরণেই হওয়া সম্ভব। গামা-রশ্মির প্রকৃতি যদিও হুবহু তাপ-রশ্মি বা আলোক-রশ্মির মতোই, তবুও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতার জন্য এর ধর্মও যথেষ্ট আলাদা। গামা-রশ্মি কঠিন বস্তুকে অনায়াসে ভেদ করে, এবং এই রশ্মির ঐ ক্ষমতা এক্স্-রশ্মির চেয়ে বেশী। অবশ্য, বাতাসের মধ্য দিয়ে বহু দূরে যাওয়া এর পক্ষে শক্ত ; কারণ, তাপ বা আলোক-রশ্মির তুলনায় গামা-রশ্মি তাড়াতাড়ি বা সহজে শোষিত হয়ে যায়। তীব্র শক্তির নিউট্রনেরও কঠিন বস্তু ভেদের ক্ষমতা প্রবল। প্রাণী-দেহের পক্ষে গামা-রশ্মি এবং নিউট্রন-রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব প্রায় একই ধরনের। [নিউট্রন বাদে অন্যান্য অনেক কণিকাও বিস্ফোরণের ফলে দেখা দেয় ; কিন্তু, তা'রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।] কিছু নিউট্রন বাতাসের নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে আরও গামা-রশ্মির জন্ম দেয়।

তৃতীয় কারণটি শহরের ঘর-বাড়ী ধ্বংসের প্রধান কারণ। বাতাসে শব্দের গতিবেগের চেয়ে বেশী গতিবেগে কোনো বস্তু অগ্রসর হ'লে বাতাসে এক বিশেষ ধরনের তরঙ্গের জন্ম হয়—যা'কে বলা হয় 'ঘাত তরঙ্গ' (shock wave)। সুপারসোনিক্ এরোপ্লেন যখন শব্দ-গতি অতিক্রম করে, তখনও এই তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, এবং তা'র সশব্দ ধাক্কায় ঘর-বাড়ী কেঁপে-ওঠা অনেকেই হয়তো লক্ষ করেছেন। পরমাণু-বোমার ক্ষেত্রে এই ঘটনাই প্রচণ্ডতর আকারে ঘটে। বিস্ফোরণে যে অতি উচ্চ চাপ সৃষ্টি হয় তা'র ফলে বোমার 'আবরণ' বা 'tamper'-এর অণু এবং বাতাসের অণু শব্দোত্তর গতিতে চতুর্দিকে ধাবমান হয়। ফলে, ঐ ঘাত-তরঙ্গের একটি নিশ্ছিদ্র প্রাচীর গ'ড়ে ওঠে এবং তা' দ্রুত অগ্রসর হ'তে থাকে। এই তরঙ্গ-প্রাচীর যত দূরে যায় তা'র চাপ অবশ্য ততই কমতে থাকে। তবে, একটি কুড়ি কিলোটন বোমার বিস্ফোরণে যে ঘাত-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তা'র চাপ বিস্ফোরণ-কেন্দ্রের হাজার ফুট দূরেও বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপের বহুগুণ বেশী থাকতে পারে। এই চাপের ঘাত-তরঙ্গ মানুষের শরীরে যতটুকু বাধা পায়—তা'তেই মানুষের বুক এবং পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে। এক মাইল দূরে এই ঘাত-তরঙ্গের ক্ষমতা অবশ্য অনেক কমে যায়। মানুষের শরীরের তেমন ক্ষতি সে আর করতে পারে না; কিন্তু, ঘর-বাড়ীর দেয়ালের প্রশস্ত বাধায় এই তরঙ্গ ধ্বংসের তাণ্ডব দেখিয়ে ছাড়ে। কয়েক মাইল দূরের সাধারণ ঘর-বাড়ী এই তরঙ্গের ধাক্কায় ধ্বসে পড়তে পারে। কিংবা, সোজাসুজি যে সব ঘর-বাড়ী ভেঙে পড়ে না, খোলা জানালা বা দরজা পথে বাতাসের তীব্র প্রবাহ ঢুকে ভিতর থেকেই তাদের দেয়াল ফাটিয়ে দিতে পারে।

ক্ষয়ক্ষতির চতুর্থ কারণ—তেজস্ক্রিয়তা। ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের বিভাজনে এবং বিস্ফোরণজনিত ক্রিয়ায় প্রচুর ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয়। অবশ্য, এদের অনেকেই দ্রুত-তেজস্ক্রিয়; অর্থাৎ—অত্যন্ত ক্ষতিকর, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয়। অনেকেরই অর্ধায়ু কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক মিনিটের ভিতরে সীমিত। বিস্ফোরণের কয়েক দিন বাদে বিস্ফোরণজনিত সামগ্রিক তেজস্ক্রিয়তা অনেক ক'মে যায়। বিস্ফোরণটি মাটি থেকে অনেক উঁচুতে ঘটানো হ'লে নিছক তেজস্ক্রিয়তার কারণে তাৎক্ষণিক ক্ষতি তেমন হয় না, যদিও দীর্ঘ-কালীন, মন্থরগতি ক্রিয়া অনেক ভাবেই হওয়া সম্ভব। তেজস্ক্রিয়াজনিত ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে আবহাওয়া-নির্ভর।

পরমাণু-বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট পরের আলোকচিত্র যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই প্যারাসুটের বা ব্যাঙের ছাতার মতো মেঘপুঞ্জ ('mushroom-cloud') দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এই 'ছাতা' আবার দু'টি দেখা যায়; একটি যেখানে

উঠে শেষ হয়, সেখান থেকে আরেকটির ওঠা শুরু হয়ে থাকে। এই মেঘপুঞ্জের উৎপত্তির দিকে একবার তাকানো যাক। বর্তমান আলোচনার শুরুতেই আমরা যে অগ্নিগোলকের কথা বলেছিলাম, তা' প্রথমে দ্রুত প্রসারিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী (ঠাণ্ডা) বাতাসের সঙ্গে ক্রমশ মিশে যাবার ফলে নিজেও ঠাণ্ডা হ'তে থাকে। এক সেকেণ্ডের কয়েক সহস্রাংশেই এই অগ্নিগোলকের ভিতরের চাপ বাইরের স্বাভাবিক চাপের সমান হয়ে দাঁড়ায়—যা'র ফলে গোলকটির প্রসারণ বন্ধ হয়। কিন্তু, উষ্ণতার কারণে এবারে সে ঊর্ধ্বমুখী হ'তে থাকে—ঠিক গ্যাস-বেলুনের মতো। উপরে ওঠার সময়ে মেঘ এবং ধূলিজালে এর পথটি চিহ্নিত হ'তে থাকে একটি বিশাল স্তম্ভের আকারে। মূলত পার্শ্ববর্তী শীতল বাতাসের স্পর্শে এই মেঘদেহের উৎপত্তি। পারমাণবিক ক্রিয়াজনিত তেজস্ক্রিয় যাবতীয় পদার্থকণিকা মোটামুটিভাবে এই মেঘদেহী স্তম্ভের ভিতরেই থাকে, এবং এই অঞ্চল তখন ধারণাতীতভাবে তেজস্ক্রিয়। কয়েক মাইল উপরে ওঠার পরে এই মেঘপুঞ্জ সাধারণত যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে যায়, এবং উপরের উষ্ণতর কোনো বাতাসের স্তর এর পথরোধ করে। এই অবস্থাতে আর উপরে উঠতে না পেরে এই মেঘ চতুর্দিকে ছড়াতে থাকে। কিন্তু, প্রচুর তেজস্ক্রিয় বস্তুর উপস্থিতির জন্য আবার নতুন ক'রে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, এবং ছাতার মতো এই মেঘপুঞ্জ থেকে আবার একটি স্তম্ভ উপরে উঠে যায়। এইভাবে প্রায় একই চেহারার দু'টি মেঘপুঞ্জ পরপর গ'ড়ে ওঠে। নাগাসাকি বা হিরোশিমার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যথাক্রমে বাইশ এবং ষোল* কিলোটন বোমার ক্ষেত্রেই ঐ মেঘপুঞ্জের উচ্চতা শেষ অবধি সাত-আট মাইলে দাঁড়িয়েছিল। এক মেগাটন বোমার ক্ষেত্রে ঐ মেঘপুঞ্জের সর্বাধিক বিস্তার দশ মাইল এবং উচ্চতা তেরো মাইল হ'তে পারে। বিশাল ঐ মেঘপুঞ্জ গ'ড়ে উঠতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। এই মেঘের সঙ্গেই অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় বস্তু ছড়িয়ে যায়। অতএব, এটি নির্ভর করে তখনকার বাতাসের বেগের উপরে। এ সময়ে ঐ অঞ্চলে দৈবাৎ বৃষ্টি শুরু হ'লে ঐ বৃষ্টির জল প্রচুর তেজস্ক্রিয় বস্তু মাটিতে নামিয়ে আনবে,—ঐ অঞ্চলে সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই যা' অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

---

* মতান্তরে, হিরোশিমাতে নিক্ষিপ্ত বোমাটির শক্তি 12.5 কিলোটন।

## দুই / পরমাণু-সংযোজন : হাইড্রোজেন-বোমার নীতি

সাধারণ পরমাণু-বোমাতে ভারী বা বড় আকারের কোনো পরমাণু কেন্দ্রকে একাধিক তুলনীয় আকারের খণ্ডে ভেঙে ফেলা হয়, এবং এর ফলে প্রচুর শক্তি মুক্তি পায়। 'হাইড্রোজেন-বোমা'র ক্ষেত্রে বিপরীত পন্থা গ্রহণ করা হয়। এখানে একাধিক অত্যন্ত হাল্কা পরমাণু কেন্দ্রকে 'গলিয়ে' ( বা fuse ক'রে ) একত্র ক'রে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের একটি পরমাণু-কেন্দ্রের রূপ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে তাই 'সংযোজন' ( বা fusion ) বলা হয়। এর ফলেও কিছুটা বস্তু শক্তিতে পরিণত হয়, এবং বিরাট পরিমাণ শক্তি মুক্ত হয়। অনেকখানি পদার্থে এই ক্রিয়া ঘটাতে পারলে অতি বিপুল শক্তির উদ্ভব সম্ভব এবং—সাধারণ পরমাণু-বোমার ক্ষেত্রেও আমরা যা' লক্ষ করেছি—এই ক্রিয়া স্বল্প পরিসরে অতি দ্রুত ঘটাতে পারলে ( যেমন—এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক-ভাগ সময়ে ) তা' একটি বিধ্বংসী বিস্ফোরণের পর্যায়ে পড়বে। এই ঘটনাকে এবারে আর একটু বিস্তৃতভাবে বোঝা যাক।

বাতাসের অণু অতি দ্রুত ভ্রাম্যমান এবং পরস্পরের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে সংঘাতময়—এটা আমাদের জানা আছে। বাতাসের তাপমাত্রা যত বাড়বে, অণুগুলোর গতি ততই দ্রুত হবে, এবং সংঘাতগুলোও হবে ততই জোরদার। কোনো গ্যাসের তাপমাত্রা যদি ক্রমাগতই বাড়ানো যায় তবে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় একটা অবস্থা আসে—যখন পরমাণুগুলোর বাইরের ইলেকট্রনিক সজ্জা একেবারে ভেঙে যায়, এবং নগ্ন পরামাণু-কেন্দ্রগুলোই অতি দ্রুত ভ্রমণ করতে থাকে। তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে যেতে থাকলে এমন একটা অবস্থাও আসতে পারে—যখন একাধিক সংঘাতশীল পরমাণু-কেন্দ্র জুড়ে গিয়ে কিছুটা বড় আকারের একটি পরমাণু-কেন্দ্র তৈরী হয়ে যাবে। নক্ষত্রের কেন্দ্রে এই ধরনের ঘটনাই ঘটে। সূর্যের কেন্দ্রের উষ্ণতা মোটামুটি দু' কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। সেখানেও হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্রের 'সংযোজন' হয়ে চলেছে, এবং সূর্যের বিরাট শক্তির এটাই উৎস। পৃথিবীতেও এই ঘটনা কৃত্রিমভাবে ঘটানো যায় কি না, এটা অনেক পরমাণু-বিজ্ঞানীর কৌতূহলের বিষয় ছিল। কৃত্রিমভাবে এটি ঘটানোর প্রধান সমস্যা ছিল—এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রচণ্ড তাপমাত্রা সৃষ্টি করা। সাধারণ পরমাণু-বোমার সাফল্য ঐ সমস্যার একটা সমাধান হিসেবে দেখা দিল। ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম-বোমার বিস্ফোরণের মুহূর্তে বিস্ফোরণ-কেন্দ্রে যে ধারণাতীত উষ্ণতা এবং চাপ সৃষ্টি হয়—সেটাই কাজে লাগানো যেতে

পারে। সংযোজন-ক্রিয়া একবার শুরু হয়ে গেলে অবশ্য তা'র উত্তাপেই ক্রিয়াটি চলতে থাকবে।

কিন্তু, এই কাজে হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্র নির্বাচন করা হয় কেন ?—কারণ, সব পরমাণুর কেন্দ্রেই এক বা একাধিক প্রোটন থাকবে। বড় পরমাণুর কেন্দ্রে থাকবে বেশী সংখ্যক প্রোটন। সুতরাং বড় আকারের দু'টি পরমাণু-কেন্দ্র কাছাকাছি এলে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ হবে বেশী। এদের একত্র ক'রে 'গলিয়ে' জোড়া দিতে গেলে অনেক বেশী প্রচেষ্টার দরকার হবে। অতএব, হাল্কাতম পরমাণুর কথাই আমরা প্রথমে ভাববো। হাইড্রোজেনের চেয়ে হাল্কা কিছুই নেই। সাধারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রে কেবল একটি প্রোটন ছাড়া কিছুই থাকে না ; তবে হাইড্রোজেনের দু'টি বিরল রূপও সম্ভব। এদের কেন্দ্রের নাম যথাক্রমে 'ডয়টারন্' ও 'ট্রাইটন্',—সংক্ষেপে D ও T। 'ডয়টারন্' বা D আসলে একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রনের সমষ্টি, এবং 'ট্রাইটন্' বা T-তে একটি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রনের সহাবস্থান। সব ক্ষেত্রেই প্রোটনের সংখ্যা 1 হওয়ায় সবগুলো পরমাণুকেই হাইড্রোজেন ব'লে স্বীকার করতে হবে। অতএব, হাইড্রোজেন-পরমাণুর তিন রকম গঠন হ'তে পারে, যা'দের কেন্দ্রের গঠন যথাক্রমে p ( কেবল একটি প্রোটন ), D ( অর্থাৎ, $p+n$ ) এবং T ( অর্থাৎ, $p+2n$ )। সুতরাং, দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের সংযোগ অনেক রকমে হ'তে পারে, যদিও বাস্তবে D+T—এই সংযোগটি সবচেয়ে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। ঐ সংযোগের ফলে একটি হিলিয়াম-পরমাণু তৈরী হয়, একটি তীব্রগতি নিউট্রন বা'র হয়, এবং প্রচুর শক্তি মুক্ত হয়। এই কাজের জন্য একটি D এবং একটি T-কে এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্য একত্র ক'রে রাখা দরকার। তবেই ওরা জুড়ে যেতে পারে। ঐ সামান্য সময়ের জন্যও ওদের একত্রে ধ'রে রাখার কাজটি সাধারণ পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণেই করা সম্ভব। তথাকথিত 'সংযোজন' একবার শুরু হয়ে গেলে যে প্রচণ্ড তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় তা'তেই ঐ ক্রিয়াটি চলতে থাকে। এখানে বলা দরকার, সূর্যের বা অন্য অনেক নক্ষত্রের কেন্দ্রের তুলনায় মানুষের গড়া 'হাইড্রোজেন-বোমা'তে 'সংযোজন'-ক্রিয়া দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হ'তে পারে। এর কারণ দু'টো : বিভাজন-ক্রিয়ার বিস্ফোরণে যে প্রাথমিক উষ্ণতা সৃষ্টি করা হয়—তা' সূর্যের কেন্দ্রের উষ্ণতার চেয়েও বেশী, এবং সংযোজন-ক্রিয়ার জন্য মানুষ কেবল সুনির্বাচিত 'জ্বালানী' (fuel) ব্যবহার করে।

একটি সমস্যা অবশ্য রয়ে গেল : T বা ট্রাইটন্ কোথায় পাওয়া যাবে ? প্রকৃতিতে সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগ 'ভারী হাইড্রোজেন' বা 'ডয়টারিয়াম্' থাকে। একে আলাদা করা সম্ভব। এই পরমাণুর

কেন্দ্রকেই আমরা D বলেছি। সুতরাং, D সংগ্রহ করা গেল। কিন্তু, T প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। একে তৈরি করতে হয়। এর জন্য 'লিথিয়াম' নামে আর একটি হাল্কা মৌলিক পদার্থের সাহায্য নিতে হয়। লিথিয়ামেরও অবশ্য একাধিক পারমাণবিক রূপ আছে। বিরলতর লিথিয়াম-6 ( বা $_3Li^6$ ) এক্ষেত্রে কাজে লাগে। এই লিথিয়াম-কেন্দ্র একটি নিউট্রন গ্রহণ ক'রে একটি হিলিয়াম-কেন্দ্র এবং একটি T-তে ভেঙে যায়। এই T-এর সঙ্গেই D যুক্ত করা হয়। অবশ্য এখানেও একটি বাস্তব সমস্যা আছে। সাধারণ অবস্থায় D ও T দুই-ই গ্যাসদেহী পদার্থ। কিন্তু, হাইড্রোজেন-বোমাতে কোনো গ্যাসকে 'জ্বালানী' হিসেবে ব্যবহার করা অসম্ভব। কারণ—গ্যাস বিরাট আয়তন দখল করতে চাইবে। তীব্র বিস্ফোরণ ঘটাতে হ'লে অল্প আয়তনে প্রচুর 'জ্বালানী' নিতে হবে। এর জন্য D ও T-কে কার্যত কল্পনাতীত ঠাণ্ডায় তরল হিসেবে রাখা যেতে পারে ; কিন্তু, এর জন্য জটিল ও অত্যন্ত ভারী যন্ত্রসজ্জা ঐ বোমাটির অঙ্গ হয়ে ওঠে। এর বিকল্প ব্যবস্থা হ'ল D এবং $Li^6$-এর একটি যৌগিক পদার্থ 'লিথিয়াম ডয়টারাইড্' (LiD) ব্যবহার করা—যা' সাধারণ পরিবেশে কঠিন অবস্থায় থাকে। এই লিথিয়াম থেকেই T পাওয়া যেতে পারে, যা' D-এর সঙ্গে যুক্ত হবে।*

সাধারণ পরমাণু-বোমার গঠনগত সমস্যা নিয়ে যেটুকু আলোচনা আমরা করতে পেরেছিলাম, হাইড্রোজেন-বোমার ক্ষেত্রে তা'ও সম্ভব হবে না। কারণ, এই বোমার কারিগরী জটিলতা সম্পর্কে প্রকাশিত আলোচনা নেই বললেই চলে। এমন কি, পরমাণু-বিজ্ঞানের যে মৌলিক গবেষণার ফলে হাল্কা পরমাণুর কৃত্রিম সংযোজন সম্ভব হয়—তা'র কোনো সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও আমরা জানতে পারি না। কারণ, হাইড্রোজেন-বোমার 'জনক' হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক এডোয়ার্ড্ টেলার্ স্পষ্টই বলেছেন—ও ইতিহাস বলা যাবে না ; ওই ইতিহাস কার্যত হাইড্রোজেন-বোমা তৈরীরই ইতিহাস। —সুতরাং, কেবল এর প্রয়োগ সম্পর্কেই বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি তথ্য আমরা তুলে দিতে পারি।

হাইড্রোজেন-বোমার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার ভিতরে নানা বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব তা'র গঠন-কৌশল অনুসারে। সাধারণভাবে বলা যায়—হাইড্রোজেন-বোমার ক্ষেত্রে নিঃসৃত নিউট্রন সাধারণ পরমাণু-বোমার ক্ষেত্রে নিঃসৃত নিউট্রনের তুলনায় তিনগুণ বেশী শক্তিশালী। অতএব, এ ক্ষেত্রে নিউট্রন-রশ্মির ধ্বংসাত্মক ভূমিকা অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কিছু মারাত্মক বৈশিষ্ট্য—যেমন, তাপ-রশ্মি, ঘাত-তরঙ্গ—এ ক্ষেত্রেও উপস্থিত থাকে। কিন্তু, তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষয়ক্ষতি এ ক্ষেত্রে

* বর্তমান আলোচনাতে D ও T দিয়ে প্রয়োজনানুসারে পরমাণু-কেন্দ্র এবং পরমাণু—দুই-ই চিহ্নিত হয়েছে। পাঠক যেন বিভ্রান্ত না-হন।

যথেষ্ট কম হয় ; কারণ, এই বোমার ক্রিয়ায় খুব কম তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেখা দেয়। T নিজেই অবশ্য তেজস্ক্রিয়, এবং অব্যবহৃত বা উদ্বৃত্ত জ্বালানীতে কিছু পরিমাণ T থেকে যায়। কিন্তু, এটি খুব ক্ষতিকর নয়। আধুনিক রণশাস্ত্রে হাল্কা এবং অল্পশক্তি হাইড্রোজেন-বোমার বিশেষ কদর আছে, যেহেতু ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে এদের সঠিক এবং সুদূর লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এই জাতীয় বোমার পক্ষে কল-কারখানা বা শহর ধ্বংস করা শক্ত ; নরহত্যাই এর প্রধান লক্ষ্য। অতএব, এই বোমা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট। তীব্র নিউট্রন-রশ্মিই এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এই ধরনের বোমাকে 'নিউট্রন-বোমা'ও বলা হয়। এই ধরনের অস্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি নগণ্য ব'লে অধ্যাপক টেলার্ একে বলেছেন 'পরিচ্ছন্ন বোমা' ('clean bomb')। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, যে কোনো হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণের পিছনেই একটি সাধারণ পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ রয়েছে, এবং শেষোক্ত বিস্ফোরণের ফল হিসেবে বেশ কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্ম হবেই।

এই সূত্রে আমরা হাইড্রোজেন-বোমার একটি উন্নত সংস্করণের কথাও বলতে পারি। হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণে অতি তীব্রগতি নিউট্রনের জন্ম হয়, এবং এই নিউট্রন পরমাণু-বোমার ক্ষেত্রে অনাদৃত $U^{২৩৮}$-এর কেন্দ্রেরও বিভাজন ঘটাতে পারে। অতএব, সাধারণ একটি হাইড্রোজেন-বোমাকে যদি প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে তৈরী একটি বদ্ধ পাত্রে রাখা হয়, তবে হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণের ফলে ঐ ইউরেনিয়ামেরও বিভাজন হবে, এবং সম্পূর্ণ অস্ত্রটির ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া আরও বেড়ে যাবে। এক্ষেত্রে বোমাটিকে অবশ্যই 'নিউট্রন-বোমা' বলা যাবে না। এই বোমাতে, বলা বাহুল্য, তিনটি স্বতন্ত্র বিস্ফোরণ কাজ করছে ( যদিও কার্যত একসঙ্গেই ) ঃ প্রথমে একটি সাধারণ পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের সাহায্যে হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হ'ল, এবং এর সাহায্যে আবার বিভাজন-ক্রিয়ায় একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হ'ল।

উল্লিখিত 'সংযোজন'-ক্রিয়ার সাহায্যে বোমা তৈরি করতে পারলেই কিন্তু বিজ্ঞানীরা তা'কে সঠিক হাইড্রোজেন-বোমা বলেন না। তাঁরা চান অল্প পরিমাণ প্লুটোনিয়াম বা ইউরেনিয়ামের সাহায্যে বহু পরিমাণ হাল্কা পরমাণুর সংযোজন ঘটাতে। এই কাজে মার্কিন বিজ্ঞানীরা এখন অত্যন্ত অগ্রসর ব'লে জানা যায়। কিন্তু, 1951 সালের 8ই এবং 24শে মে আমেরিকা যথাক্রমে George এবং Item নামে প্রথম যে দু'টি হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, তা'দের ক্ষেত্রে 'সংযোজন'-ক্রিয়াটি শুরু করতে যথেষ্ট বেশী পরিমাণ বিভাজনসাধ্য বস্তু ব্যবহার করতে হয়েছিল। সেই হিসেবে মার্কিন বিজ্ঞানীরা 1952 সালের 1লা নভেম্বরের

বিস্ফোরণটিকেই ( সাংকেতিক নাম—Mike ) প্রথম সত্যিকার হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণ ব'লে মনে করেন। এই বোমাটি ছিল দশ মেগাটন শক্তির বোমা, অর্থাৎ হিরোশিমায় ব্যবহৃত বোমার চেয়ে প্রায় ছ'শো গুণ বেশী শক্তিমান। নিকিতা ক্রুশ্চেভ্-এর একটি বিবৃতি থেকে মনে হয়—ঐ উন্নত ধরনের হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণ রাশিয়া প্রথম ঘটায় 1955 সালের নভেম্বরে। এই প্রস্তুতির পিছনে মার্কিন প্ররোচনা অনেকখানি কাজ করেছে নিঃসন্দেহে। কেবল 1954 সালেই আমেরিকা উন্নত হাইড্রোজেন-বোমার যতগুলো বিস্ফোরণ ঘটায়—তাদের মিলিত শক্তি প্রায় পঞ্চাশ মেগাটন। এই বিস্ফোরণগুলোর সাংকেতিক নাম আমরা কালানুক্রমে উল্লেখ করছি ঃ Bravo ( 14·8 মেগাটন ), Romeo ( 11·0 ), Koon ( 0·1 ), Union ( 6·9 ), Yankee ( 13·5 ) এবং Nectar ( 1·7 )।

হাইড্রোজেন-বোমার গঠনে অনেক বেশী কারিগরী জটিলতা দেখা দিলেও এখানে জ্বালানীর খরচ অনেক কম। সাধারণ পরমাণু-বোমার জ্বালানী, অর্থাৎ—ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম, সংগ্রহ করা অনেক বেশী কঠিন।

## তিন / 'ম্যান্‌হাটান্ প্রোজেক্ট্'

1938 সালের শেষ দিকে পরমাণু-বিভাজনের আবিষ্কার এবং এর অব্যবহিত পরেই ইউরেনিয়ামের ধারাবাহিক বিভাজনের বাস্তব সম্ভাবনা আমেরিকাবাসী কিছু বিজ্ঞানীর বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই চিন্তার একটা অংশে ছিল নিছক বিজ্ঞানগত কৌতূহল; কিন্তু, প্রধান ভাবনা দেখা দিল আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে।

1939 সালের প্রথম দিকেই আমেরিকায় খবর এল—সদ্য অধিকৃত চেকোস্লোভাকিয়া থেকে যা'তে ইউরেনিয়াম একদম পাচার না হয়, সেজন্য জার্মান সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। ইউরোপে ইউরেনিয়ামের সবচেয়ে ভালো দু'টো উৎস ছিল চেক্-দেশ আর বেলজিয়াম। প্রথমটা জার্মানদের হাতে চ'লে গেছে; এখন বেলজিয়ামের ইউরেনিয়াম যা'তে গোপন জায়গাতে সরিয়ে ফেলে হিটলারের দৃষ্টি থেকে বাঁচানো যায়, সেটা একান্তই করা দরকার। এ সব ভাবনা যাঁরা ভাবছিলেন, তাঁদের অন্যতম হ'লেন লিও জিলার্ড, ইউজিন্ ভিগ্‌নার্, এন্‌রিকো ফের্মি, এড্‌ওয়ার্ড্ টেলার্ ইত্যাদি। এঁদের অধিকাংশই তখন আমেরিকায় সদ্য এসেছেন; অনেকেই তখনও নাগরিকত্ব পান নি। আমেরিকা সরকার এঁদের কাছ থেকে সামরিক বিষয়ে কোনো গোপন পরামর্শ নেবেন—এটা অপ্রত্যাশিত। তা'ছাড়া 'ইউরেনিয়াম' তখনও রাজনীতিবিদের কাছে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন নাম। এ ব্যাপারে তখন মার্কিন সরকারের মাধ্যমে বেলজিয়াম-সরকারকে সতর্ক করার আশা আগন্তুক বিজ্ঞানীদের পক্ষে নিছক দুরাশা। এমন সময়ে ভিগ্‌নারের খেয়াল হ'ল আইনস্টাইনের কথা। তাঁর বিরাট সম্মান এবং পরিচিতি ব্যবহার করতে পারলে মার্কিন প্রেসিডেণ্টের কানে হয়তো কিছু কথা পেঁছে দেওয়া যায়।

আইনস্টাইন্ তখন লং আইল্যাণ্ডে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাচ্ছিলেন এক বন্ধুর বাড়ীতে। সেখানে জিলার্ড এবং ভিগ্‌নার গিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পরামর্শ করলেন। আপেক্ষিক-তত্ত্বের জনক তখন পরমাণু-বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন না; তাঁর গবেষণার বিষয় তখন ছিল একেবারে আলাদা। সুতরাং, পরমাণু-বিজ্ঞানের তেমন বিস্তারিত খবর, বিশেষত—পরমাণু-বিভাজনের খবর, তিনি রাখতেন না। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইউরেনিয়ামের গুরুত্ব চট ক'রে বুঝতে পারাও তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল। তবু, সম্পূর্ণ অবস্থাটা শুনে তিনি আগন্তুকদের সঙ্গে একমত হলেন। ঠিক হ'ল—বেলজিয়াম-সরকারকে চিঠি লেখা হবে, এবং সেইসঙ্গে

বিষয়টি মার্কিন সরকারেরও গোচরে আনতে হবে। দ্বিতীয় কাজের জন্য জিলার্ড এবং ভিগ্‌নার একটি চিঠির খসড়া তৈরি করবেন, যে চিঠিতে সই করবেন কেবল আইনস্টাইন। জিলার্ডের এক সাংবাদিক-বন্ধুর মধ্যস্থতায় আলেকজান্দার স্যাক্‌স্‌-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হ'ল। মিঃ স্যাক্‌স্ একজন ব্যাঙ্কার, অর্থনীতিবিদ্ এবং—সবচেয়ে জরুরী কথা—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত বন্ধু। সমস্ত কথা শুনে মিঃ স্যাক্‌স্ আইনস্টাইনের চিঠি প্রেসিডেণ্টের হাতে পেঁছে দিতে রাজী হলেন, নিজের ব্যক্তিগত সুপারিশ সমেত। চিঠির বয়ান তৈরি ক'রে নিয়ে জিলার্ড এবং এডোয়ার্ড টেলার্ (পরবর্তীকালে 'হাইড্রোজেন-বোমার জনক' হিসেবে খ্যাত) গেলেন আইনস্টাইনের কাছে। কিন্তু, চিঠির ভিতরে এবারে একটা বাড়তি বক্তব্যও ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। এই বাড়তি অংশে পরমাণু-বোমা তৈরির বাস্তব সম্ভাব্যতা মার্কিন সরকারকে গোপনে পরীক্ষা ক'রে দেখতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আইনস্টাইন সেই চিঠি প'ড়েও দেখলেন না। ভাবলেন—এর বিষয়বস্তু আগেকার আলোচনায় তাঁর জানা হয়েই গিয়েছে। সুতরাং, কিছু না-দেখেই আবেদন-পত্রে তিনি সই ক'রে দিলেন। মার্কিন সরকারকে পরমাণু-বোমা তৈরির জন্য এই প্রথম উস্কানি দেওয়া হ'ল। পরবর্তী কালে আইনস্টাইন ঐ একটি সই-এর জন্য জীবনের শেষ অবধি অনুতাপ করেছেন। তাঁকে না জানিয়ে নতুন বক্তব্যে সই করিয়ে নেওয়ায় ক্ষুব্ধও হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক টেলার্‌ও পরে বলেছেন—দরখাস্তটা জিলার্ড পকেটে ক'রে তৈরি ক'রেই এনেছিলেন ; আইনস্টাইন কিছু না দেখে তা'তে সই ক'রে দেন। অন্যদিকে জিলার্ড এ অভিযোগ স্বীকার করেননি। তিনি পরে বলেছিলেন—ঐ দরখাস্ত স্বয়ং আইনস্টাইন আমাকে মুখে মুখে ব'লে যান ; আমি লিখে নিই। আমি ওটা তৈরি ক'রে আনিনি। যাইহোক, মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে লেখা আইনস্টাইনের ঐতিহাসিক চিঠিটি এই :

মহাশয়,

ই. ফের্মি এবং এল্. জিলার্ড-এর কিছু সাম্প্রতিক কাজ—যা' আমাকে পাণ্ডুলিপির আকারে জানানো হয়েছে—তা' থেকে আমি এই ধারণায় পেঁছোচ্ছি যে, মৌলিক পদার্থ 'ইউরেনিয়াম' অদূর ভবিষ্যতে শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হতে পারে। অবস্থা যা' দাঁড়িয়েছে তা'র কয়েকটি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, প্রশাসনের তরফে দ্রুত সক্রিয় হওয়া দরকার মনে হয়। সুতরাং, নীচের ঘটনাবলী এবং প্রস্তাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য ব'লে আমি বিশ্বাস করি।

ফ্রান্সে জোলিও এবং আমেরিকাতে ফের্মি এবং জিলার্ডের কাজের ফলে গত চার মাসের ভিতরে এটা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে যে, ইউরেনিয়ামের একটি বড় গোলায় একটি ধারাবাহিক পারমাণবিক ক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা যেতেও পারে, যা'র ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তি এবং রেডিয়াম-জাতীয় নতুন মৌলিক বস্তু উৎপন্ন হ'তে পারে। এখন প্রায় নিশ্চিত মনে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতেই এটা ঘটানো যাবে।

এই নতুন ঘটনার ফলে বোমা গঠনও করা যাবে, এবং—আন্দাজ করা যায়—যদিও অনেক অল্প নিশ্চয়তায়, নতুন ধরনের অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা এভাবে তৈরী হ'তে পারে। এ ধরনের একটিমাত্র বোমা জলযানবাহিত হয়ে কোনো বন্দরে বিস্ফোরণ ঘটালে সহজেই সম্পূর্ণ বন্দর এবং সংলগ্ন কিছু অঞ্চল এক সঙ্গেই ধ্বংস হ'তে পারে। অবশ্য, এ ধরনের বোমা এরোপ্লেনে বাহিত হবার পক্ষে হয়তো খুব ভারী ব'লে প্রমাণিত হ'তে পারে।

ইউরেনিয়ামের কেবল নিকৃষ্ট আকরিকই অল্প পরিমাণে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। কানাডাতে এবং প্রাক্তন চেকোস্লোভাকিয়াতে কিছু উৎকৃষ্ট আকরিক আছে, যদিও ইউরেনিয়ামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস বেলজিয়ান কঙ্গো।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকায় পদার্থবিদ্‌দের যে দলটি ধারাবাহিক বিভাজন নিয়ে কাজ করছেন—তাঁদের সঙ্গে প্রশাসনের একটি স্থায়ী সংযোগ রক্ষা করা আপনি হয়তো উচিত মনে করতে পারেন। এটি করার একটি সম্ভাব্য পথ হচ্ছে এমন কোনো ব্যক্তিকে এই কাজে নিযুক্ত করা যিনি আপনার বিশ্বাসভাজন এবং যিনি সম্ভব হ'লে পদাধিকার বল ছাড়াই কাজ করতে পারবেন। তাঁর কাজের ভিতরে এইগুলো থাকতে পারে ঃ

(ক) সরকারী বিভাগগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা, পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা, এবং সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে সুপারিশ করা—যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইউরেনিয়াম আকরিকের সরবরাহ লাভের সমস্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে।

(খ) যাঁরা অগ্রসর হ'তে ইচ্ছুক, তাঁদের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির যোগাযোগের মাধ্যমে —যদি দরকার হয়—অর্থ সাহায্য দিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণাকে দ্রুত করা, যা' এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের সীমিত অর্থবলে চালানো হচ্ছে, এবং সম্ভব হ'লে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণাগারের সাহায্য নেওয়া—যা'দের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আছে।

আমি জানি—জার্মানী তার অধিকৃত চেকোস্লোভাকিয়ার খনি থেকে ইউ-রেনিয়াম বিক্রি করা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। তার এ ধরনের অবিলম্ব সক্রিয়তাকে

বোধহয় বোঝা উচিত জার্মান রাষ্ট্রীয় উপসচিবের পুত্র ফন্‌ ভিৎজেকার্‌-এর সঙ্গে বেৰ্লিনের কেইজার-ভিল্‌হেম্‌ ইন্‌স্টিট্যুট্‌-এর সম্পর্কের ভিত্তিতে—যেখানে আমেরিকার ইউরেনিয়াম-ঘটিত কিছু গবেষণার এখন পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে।

আপনার একান্ত

এ. আইনস্টাইন

চিঠির তারিখ : 2রা আগস্ট, 1939।

স্যাক্‌স্‌ এই চিঠি নিয়ে সদাব্যস্ত প্রেসিডেণ্টের সামনে যেতে পারলেন বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে। রুজভেল্ট্‌ প্রথমে বিষয়টিকে আমল দেননি। বলেছিলেন : বিষয়টি চিত্তাকর্ষক; কিন্তু সরকারী হস্তক্ষেপ লাভের পরিপক্কতা এর নেই। স্যাক্‌স তাঁর বাগ্মিতার সুকৌশল প্রয়োগে এবং অনেক ধৈর্য ধ'রে তবেই তাঁর প্রেসিডেণ্ট্‌-বন্ধুকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী করতে পেরেছিলেন। সেই তারিখটি হ'ল 11ই অক্টোবর, 1939। রাজী হবার পরে রুজভেল্ট্‌ কিন্তু বিষয়টিকে অবহেলা করলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ 'ন্যাশনাল্‌ অ্যাকাডেমী অব্‌ সায়েন্সেস্‌'-কে নির্দেশ দিলেন—ইউরেনিয়ামের বিষয়ে একটি 'পরামর্শদাতা সমিতি' ( Advisory Committee ) গঠনের জন্য। এই সমিতির কাজ হবে—বিভাজনঘটিত গবেষণায় সহযোগিতা করা এবং তৎকালীন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য পরমাণু-বোমা তৈরীর সম্ভাবনা বিচার করা। 'ন্যাশনাল ব্যুরো অব্‌ স্ট্যাণ্ডার্ড্‌স্‌'-এর পরিচালক ব্রিগ্‌স্‌ ( Lyman J. Briggs )-এর নেতৃত্বে ঐ ইউরেনিয়াম সংগঠন দ্রুত গঠিত হ'ল। কিন্তু, পরবর্তী প্রায় দেড় বছরে কাজ এগোল খুই সামান্য। এর প্রধান কারণ—বিদেশী পদার্থবিদ্‌দের সম্পর্কে ঐ সংগঠনের সন্দেহবাতিক। আমেরিকাতে তখন পরমাণু-বিজ্ঞান গবেষণায়, বিশেষত—বিভাজনঘটিত গবেষণায়, সদ্য আগত বিদেশী পদার্থবিদ্‌দের ভূমিকাই প্রধান ( এবং পরবর্তী কালে পরমাণু-বোমাও তৈরী হয়েছে প্রধানত এঁদেরই চেষ্টাতে )। দ্বিতীয় কারণ : আমেরিকান্‌ পদার্থবিদ্‌দের অনুসন্ধিৎসার মূল প্রেরণা তখন ছিল নিছক জ্ঞানতৃষ্ণা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় তখন বহু বিজ্ঞানীর অস্ত্রনির্মাণকারীর ভূমিকায় দেখা দিতে উৎসাহের অভাব ছিল।

তবে, 1940-এর শেষে ইউরোপে যুদ্ধের তীব্রতার ফলে আমেরিকাতেও প্রস্তুতির নতুন প্রেরণা আসে। একটি নতুন 'ন্যাশনাল ডিফেন্স্‌ রিসার্চ্‌ কমিটি' (NDRC) তৈরি হয়—যা'র অধিকর্তা হন 'কার্নেগী ইন্‌স্‌টিট্যুসন্‌'-এর পরিচালক ভ্যানেভার্‌ বুশ্‌ ( Vannevar Bush )। ইনি তথাকথিত 'ইউরেনিয়াম সমিতি'কে স্বীকৃতি দিয়ে দ্রুতগতি কর্মসূচী হাতে নিতে চাইলেন। কিন্তু, আসল কাজ যে কী—তাই-ই তখন বোঝা যাচ্ছিল না। পরমাণু-বোমা আসলে কী, তা'র ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার প্রধান

কারণই বা কী, এবং—যে $U^{235}$-এ বিভাজনধারা ঘটানো যায়—তা'কে আলাদা এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবার শ্রেষ্ঠ উপায়ই বা কী,—কোনো প্রশ্নেরই স্পষ্ট জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না।

এই সময় পর্যন্তও পরমাণু-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল ব্রিটেন। কিন্তু, পরমাণু-বোমার বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক গবেষণার আয়োজন এবং বিপুল অর্থব্যয়—দু'টোই তা'র তখনকার অবস্থায় অসম্ভব। ব্রিটিশ পরমাণু-বিজ্ঞানীরা তখন উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে আছেন আমেরিকার দিকে, অথচ আশা করছেন—যুদ্ধকালীন এই কর্মসূচীর রূপায়ণে তাঁদেরও ডাকা হবে। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে পরমাণু-বিভাজন নিয়ে যুক্তভাবে গবেষণা করছিলেন ফ্রিশ্ (Otto R. Frisch) এবং পিয়েরল্স্ (R. E. Peierls)। এঁরা কাগজে-কলমে হিসেব ক'রে দেখান (এপ্রিল 1941)—প্রায় বিশুদ্ধ $U^{235}$ দিয়ে এমন একটি বোমা তৈরি করা যায়, এরোপ্লেনে নিয়ে যাবার পক্ষে যা' যথেষ্ট হাল্কা। এই খবর আমেরিকাতে পেঁছোলে নতুন উৎসাহে $U^{235}$ আলাদা করার কাজ শুরু হয়। বাস্তবে, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম (অর্থাৎ—$U^{235}$ এবং $U^{238}$-এর মিশ্রণ) থেকে $U^{235}$-এর ক্ষীণ উপস্থিতিকে (শতকরা মাত্র 0·71 ভাগ) আলাদা করা খুবই শক্ত কাজ। রাসায়নিক পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে অচল, যেহেতু ঐ দুই ইউরেনিয়ামের রাসায়নিক ধর্ম একই। ঐ দুই ইউরেনিয়ামের ওজনের সূক্ষ্ম পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে অথবা অন্য কোনো কৌশলে বিশুদ্ধ $U^{235}$-কে আলাদা করার কাজ চলতে লাগল।

অন্যদিকে, মার্কিন সরকারের পদক্ষেপের ধীরগতিতে বিশিষ্ট অনেক বিজ্ঞানীর ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছিল। এঁদের ভিতরে হ্যারল্ড্ উরে (Harold C. Urey), আর্নেস্ট লরেন্স্ (Ernest O. Lawrence), আর্থার কম্‌টন্ (Arthur H. Compton) 'ইউরেনিয়াম সমিতি'র কঠোর সমালোচনা করলেন। বুশ্ বুঝলেন—NDRC-র পক্ষে নানা কারণে দ্রুত অগ্রসর হওয়া শক্ত। তিনি রুজভেল্টের অনুমোদনক্রমে আরও শক্তিশালী সংগঠন 'অফিস্ অব্ সায়েণ্টিফিক রিসার্চ্ অ্যাণ্ড্ ডেভেলপ-মেণ্ট্' (OBSD) গ'ড়ে নিজে তা'র পরিচালক হলেন; হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট কোন্যাণ্ট্ (James B. Conant) হ'লেন উপ-পরিচালক। 'ইউ-রেনিয়াম সমিতি'কেও ঢেলে সাজিয়ে উরে, লরেন্স এবং কম্‌টন্‌কে তা'র নায়কত্ব দেওয়া হ'ল। 1942 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে কাজকর্ম দ্রুত এগোতে লাগল। তিন মাসের মধ্যে কর্মীর সংখ্যা বেড়ে 45 থেকে হ'ল 1250।

এই সময়ে কলম্বিয়াতে এন্‌রিকো ফের্মি এবং তাঁর সহযোগীরা প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে বিভাজন-ধারা ঘটানোর পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। এক্ষেত্রে শ্লথগতি নিউট্রনের সাহায্যে বিভাজন-ধারাটি দ্রুত অগ্রসর হ'তে পারে না—যা' পারে বিশুদ্ধ

$U^{235}$-এর ক্ষেত্রে [ প্রথম পরিচ্ছেদের আলোচনা দ্রষ্টব্য ]। কিন্তু, ফের্মি চাইছিলেন—বোমার ক্ষেত্রে বিভাজন-ধারাটি যেমন ক্রমস্ফীত হয়ে থাকে, তেমন না-হয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় ধীরগতিতে তা' চলতেই থাকবে। এটা সম্ভব হ'লে পারমাণবিক শক্তির এমন একটি নিয়ন্ত্রিত উৎস পাওয়া যাবে—যা' গঠনমূলক বা কল্যাণকর কাজে লাগানো সম্ভব। বিভাজনে যেহেতু দ্রুতগতি নিউট্রনের জন্ম হয়, এবং $U^{235}$-এর বিভাজনে যেহেতু বিশেষ শ্লথগতি নিউট্রনই বেশী উপযুক্ত, অতএব—বিভাজনজাত দ্রুতগতি নিউট্রনদের প্রথমে শ্লথ ক'রে নিয়ে তবেই তাদের সঙ্গে ইউরেনিয়ামের পরবর্তী সংঘাতের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এই ব্যবস্থা ফের্মি করেছিলেন এইভাবেঃ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের এক-একটি লম্বা লম্বা খণ্ড বা দণ্ড খানিক তফাতে তফাতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। মধ্যবর্তী জায়গাগুলো ভরাট ক'রে দেওয়া হ'ল গ্রাফাইট্ দিয়ে। ইউরেনিয়ামের কোনো একটি খণ্ড থেকে বিভাজনজাত নিউট্রনগুলো বা'র হয়ে গ্রাফাইটের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করবে গ্রাফাইটের পরমাণু-কেন্দ্রের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে।* এইভাবে এদের ভিতরে কোনো একটি নিউট্রন যখন ইউরেনিয়ামের অন্য একটি খণ্ডে পেঁছোবে, তখন সে যথেষ্ট শ্লথগতি হয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের ব্যবস্থায় অধিকাংশ নিউট্রন নানাভাবে নষ্ট হবে। ক্ষরণ বা leakage-এর প্রশ্ন তো আছেই; তা' ছাড়া প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের খণ্ডে অধিকাংশই $U^{238}$-এর পরমাণু রয়েছে ব'লে অধিকাংশ নিউট্রন এদের সঙ্গেই ধাক্কা খাবে,—যা'র ফলে বহু নিউট্রন ঐ সব $U^{238}$-এ শোষিত হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে (1940) প্লুটোনিয়াম ($Pu^{239}$) আবিষ্কৃত হয়েছে; এবং এর কিছু দিনের মধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সীবর্গ্ (Glenn T. Seaborg) দেখিয়েছেন—বিভাজন-ধারা গ'ড়ে তোলার জন্য এই নব আবিষ্কৃত $Pu^{239}$ আরও বেশী উপযুক্ত। এই বস্তুটি তৈরী হয় যখন $U^{238}$ একটি নিউট্রন শোষণ করে—প্রথম পরিচ্ছেদে যা' আমরা বলেছি। অতএব, ফের্মি ইত্যাদি বিজ্ঞানীরা যে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন তা'তে আপনা থেকেই যথেষ্ট প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের সম্ভাবনা, এবং আপাত অবাঞ্ছিত $U^{238}$-এর উপস্থিতি এইভাবে সার্থক। যেহেতু ফের্মির গবেষণার সামরিক তাৎপর্য প্রকট হয়ে পড়ল, সুতরাং 1942-এর এপ্রিল-মে নাগাদ তাঁকে নিয়ে আসা হ'ল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামের এক নিভৃত কোণে। সেখানে তিনি পৃথিবীর প্রথম

---

* গ্রাফাইট্ এখানে শ্লথকারী বস্তু বা moderator-এর কাজ করছে। বর্তমানে গ্রাফাইটের বদলে সাধারণত 'ভারী জল' ( heavy water ) ব্যবহৃত হয়। সাধারণ জলের অণুতে দুটি সাধারণ হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। ভারী জলে থাকে ভারী হাইড্রোজেনের ( D-র ) পরমাণু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

'নিয়ন্ত্রিত বিভাজন-ধারা' ( controlled chain-reaction ) ঘটালেন অত্যন্ত গোপনে 1942-এর 2রা ডিসেম্বর। ওপরওয়ালার কাছে সাফল্যের সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠানো হ'ল : The Italian navigator has landed. The natives are friendly.—এখানে অবশ্য একথাও বলা দরকার : ফের্মির ঐ ঐতিহাসিক যন্ত্রটি [ 'Fermi's Pile' নামে পরিচিত ] শক্তি উৎপাদনের কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেনি। এর মূল সার্থকতা ছিল প্লুটোনিয়াম উৎপাদনে।

1942-এর মে-মাসে ঠিক হ'ল—বিশেষ দু'টি পদ্ধতিতে $U^{235}$ আলাদা করার রীতিমত কাজ শুরু হবে, আর সেই সঙ্গে প্লুটোনিয়াম তৈরির কাজেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে বুশ্ মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে সুপারিশ করেছেন—বিভাজনসাধ্য বস্তু তৈরীর জন্য সামরিক বিভাগের মাধ্যমে যেন একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এর ফলে আগস্ট্ মাসে সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডটি সামরিক বিভাগের হাতে চ'লে গেল। এই সময় থেকে কর্মসূচীটি 'ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্ট্' নামে পরিচিত হয়। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সামরিক বিভাগের এঞ্জিনীয়ার্—ব্রিগেডিয়ার্ জেনারেল গ্রোভ্স্ (Leslie R. Groves) এই প্রোজেক্টের সর্বময় কর্তা নিযুক্ত হলেন। এর আগে ইনি 'পেণ্টাগন্ হাউস্' তৈরির দায়িত্ব নিয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত পরিশ্রমী, সতর্ক, কর্তৃত্বপ্রবণ ও আত্মগর্বী। এঁর সঙ্গে সহযোগী হিসেবে রইলেন বুশ্ এবং কোন্যাণ্ট্। এই সময় থেকে সরকারী অনুদানপুষ্ট তিনটি সংস্থার গবেষণাগারে কিছু কাজ আংশিকভাবে কেন্দ্রীভূত হ'ল : কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু, ঈপ্সিত বোমাটির গঠন-বিষয়ক গবেষণার জন্য একটি বিশেষ গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। ডিসেম্বর মাসে গ্রোভ্স্ ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্টের পরিচালক হিসেবে বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক ওপেন্হাইমার্ ( Julius R. Oppenheimer )-কে নির্বাচন করলেন। ওপেন্হাইমার্ কিছুদিন ধ'রেই পরমাণু-বোমার নানা দিক নিয়ে মূল্যবান গবেষণা করছিলেন। ওপেন্হাইমারের ইচ্ছা ছিল—ক্যালিফোর্নিয়াতেই ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্টের গবেষণার মূল কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু, গ্রোভ্স্ কোনো জনাকীর্ণ অঞ্চলে ঐ বিপজ্জনক কাজ চালাতে রাজী ছিলেন না। তখন ওপেন্হাইমারের মনে পড়ল নিউ মেক্সিকোতে 'লস্ অ্যালামোস্'-এর কথা। ওখানে সাগরতলের সাত হাজার ফুট উচ্চতায় একটি বোর্ডিং-স্কুল ছিল,—স্বয়ং ওপেন্হাইমার্ যেখানে এক সময়ে কিছুদিন ছাত্র ছিলেন। সামরিক বিভাগের নির্দেশে স্কুল তুলে দিয়ে সেখানেই ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্টের প্রধান কর্মকেন্দ্র তৈরী হ'ল।

এই পর্যন্ত আমরা যেটুকু আলোচনা করলাম, তা' 'ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্ট' গঠনের পটভূমিমাত্র। এই প্রোজেক্টের স্থায়িত্বকাল মোটামুটিভাবে ধরা যায় 1942-এর আগস্ট থেকে জাপানে পরমাণু-বোমা নিক্ষেপ পর্যন্ত,—যদিও সরকারী-ভাবে এর সমাপ্তি ঘোষণা সম্ভবত কোনো দিনই হয়নি। এই তিন বছরের ইতিহাস এখানে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে একাধিক সুখপাঠ্য এবং নির্ভরযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছে—উৎসাহী পাঠক যা' অনায়াসে দেখতে পারেন। অবশ্য, এর বিজ্ঞানগত ইতিহাস তেমন বিস্তারিত আকারে পাওয়া যায় না ; কিন্তু, এর প্রশাসনিক ইতিহাস, এবং সেইসঙ্গে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বহু বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ স্পর্শ ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্টের কাহিনীকে পরম আকর্ষণীয় ক'রে তোলে।

লস্ অ্যালামোস্-এ প্রায় দেড় লক্ষ অধিবাসী কষ্টকর জীবন কাটাতেন। গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনে এখান থেকে বাইরে চিঠিপত্রের স্বচ্ছন্দ আনাগোনা হ'তে পারতো না। কর্মীরাও যখন খুশী এখান থেকে অন্যত্র যেতে পারতেন না। দীর্ঘকালীন নির্বাসনের কথা ভেবে কর্মীদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সপরিবারে থাকতে। কিন্তু, এত লোকের অনায়াস জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। স্থানাভাব, জলাভাব, খাদ্যাভাব, বিদ্যুতের অভাব, চিকিৎসার সীমিত ব্যবস্থা—সব কিছুই মেনে নিতে হয় কর্মীদের। জলাভাব এক সময়ে এমন পর্যায়ে পেঁছোয়—সকালে দাঁত মাজার পরে কোকা-কোলা দিয়ে মুখ ধুতে হয়। এর ভিতরেই যুদ্ধ-কালীন জরুরীত্বে কর্মীদের একাগ্র মনোযোগে কাজ চালাতে হয়। জেনারেল গ্রোভ্স্-এর ব্যবস্থায় গোপনীয়তা রক্ষার নিপুণ আয়োজনে ত্রুটি ছিল না। লস্ অ্যালামোস্-এ মোট সাতটি বিভাগ ছিল ঃ Theoretical Physics Division, Advanced Development Division, ইত্যাদি। এক বিভাগের খবর অন্য বিভাগের কর্মীরা জানতে পারতেন না। সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডটির কথা জানতেন নিতান্ত মুষ্টিমেয় কিছু বিজ্ঞানী। আর সবাই জানতেন কেবল নিজের দায়িত্বের অংশটুকু। কোনো বিজ্ঞানীর নামের আগে 'ডক্টর' কিংবা 'প্রোফেসর্' লেখা নিষিদ্ধ ছিল ; সকলেই ছিলেন 'মিস্টার'। ঐ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক ডক্টরের উপস্থিতি যা'তে প্রকট না-হয়, তা'ই ওই ব্যবস্থা। লস্ অ্যালামোস্, ওক্ রিজ্ এবং হ্যান্ফোর্ড্—তিনটি শহরই 'গোপন শহর' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ওক্ রিজ-এ $U^{235}$ আলাদা করার এবং হ্যান্ফোর্ড্-এ প্লুটোনিয়াম তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য, অতি গোপনীয়তার কারণে কিছুকাল পরেই অধিকাংশ কর্মী কাজের উৎসাহ ক্রমশ হারাতে থাকেন। কারণ, যে কাজে তাঁদের প্রায় সমস্ত দিন-রাত্রি মনোযোগ দিতে হচ্ছিল, সে কাজটি কী—সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো

ধারণাই ছিল না। সুতরাং, তাঁদের কর্মোদ্যম ফিরিয়ে আনবার জন্য এক সময়ে সম্পূর্ণ কাজের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে তাঁদের গোচরে আনতে হয়।

1943-এর ডিসেম্বর মাস থেকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী-দল আসতে শুরু করেন ম্যান্‌হাটান্ প্রোজেক্টে অংশ নেবার জন্য,—যা' তাঁরা একান্তভাবে অনেক দিন ধ'রে আশা করছিলেন। ডেনমার্ক্ তখন জার্মানীর অধিকারে। ঐ দেশের স্বনামধন্য পদার্থবিদ্ নীল্‌স্ বোর্ ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসেবে এলেন লস্ অ্যালামোস্-এ একজন উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে। বোর্ এই কর্মকাণ্ডের আশু সাফল্যের চেয়ে দূরবর্তী ফলাফলের দিকে নজর দিলেন বেশী। পরমাণু-বোমার গোপন রহস্য চিরদিনই গোপন থাকবে না, এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য উন্নত দেশগুলোও এর অধিকারী হবে—এটা বোর্ স্পষ্ট বুঝলেন। অতএব, তাঁর মনে হ'ল, পরমাণু-বোমার উপরে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী—যা'তে মানব-জাতির চূড়ান্ত সর্বনাশ হ'তে না পারে। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি চাইলেন—ম্যান্‌হাটান্ প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য গোপন না রেখে আমেরিকা (এবং ব্রিটেন) বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে, বিশেষত—সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে, তখনই আলোচনায় বসুক। 1944 সালের এপ্রিলে বোর্ ইংল্যাণ্ডে ফিরলেন চার্চিলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে। এই আলোচনা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হ'ল। বোর্ সুবক্তা ছিলেন না; রাজনীতির গভীর জ্ঞানও তাঁর থাকবার কথা নয়। তাঁর নীচু গলার একটানা, অসংবদ্ধ কথা শুনতে শুনতে চার্চিলের ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। অভদ্রভাবে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন। বোর্ ফিরে এলেন লস্ অ্যালামোস্-এ। জুলাই মাসে তিনি আলোচনায় বসলেন প্রেসিডেণ্ট্ রুজভেল্টের সঙ্গে। রুজভেল্টের ভদ্র, বিনয়ী ব্যবহারে বোর্ মনে করলেন আলোচনাটি সফল হয়েছে। কিন্তু, সেপ্টেম্বর মাসে কুইবেক্-এ চার্চিলের সঙ্গে রুজভেল্টের দেখা হ'ল, এবং নীল্‌স্ বোর্‌কে তাঁরা দুজনেই নজরে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুদ্ধকালীন আবহাওয়ায় দুই বৃহৎ নায়কের ঐ মনোভাবে বোর্-এর জীবন বিষময় হয়ে উঠতে পারতো—যদি না স্বয়ং বুশ্ বোর্‌কে বাঁচাবার চেষ্টা করতেন। বুশ্ মার্কিন সরকারকে বোঝালেন—বোর্-এর মতামত যাই হোক, আমেরিকা-সরকারের স্বার্থবিরোধী কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

পরমাণু-বোমার বাস্তব গঠনের—বিশেষত, বিস্ফোরণটি সঠিকভাবে শুরু করার—সমস্যা নিয়ে জোরদার গবেষণা হয় 1944-এর শুরু থেকেই। তথাকথিত 'বন্দুক-প্রণালী'টি [ প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত ] নিখুঁত করে তোলার জন্য সব রকম চেষ্টা হ'তে থাকে। এই সময়ে গবেষকদের প্রয়োজনে যে ইউরেনিয়াম-235 এবং প্লুটোনিয়াম্ আনা হ'ত, তা'র পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। কর্তৃপক্ষের

কঠোর নির্দেশ ছিল—বোমা তৈরীর জন্য যতখানি প্রয়োজন, তা'র তুলনীয় পরিমাণের ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম যেন কিছুতেই আনা না-হয়। এই বছরের মাঝামাঝি জানা গেল—প্লুটোনিয়াম-239 একেবারে বিশুদ্ধ পাওয়া সম্ভব হবে না। এর সঙ্গে প্লুটোনিয়াম-240-এর অশুদ্ধি তথাকথিত 'বন্দুক-প্রণালী'র সাফল্যকে অসম্ভব ক'রে তুলবে। এই সময় থেকেই 'কেন্দ্রমুখী বিস্ফোরণ' বা 'implosion'-এর পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়, এবং মূলত ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এই জটিল পরিকল্পনাটির বাস্তব রূপায়ণ শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

1944-এর শেষের দিকে জার্মানীর সম্পূর্ণ পতন বা পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়, এবং জেনারেল গ্রোভ্‌স্‌ শঙ্কিত হয়ে আরও দ্রুত অগ্রগতির তাগাদা দিতে থাকেন। তিন বছর আগে ব্যস্ততার কারণ ছিল আলাদা ঃ পরমাণু-বোমা জার্মানী আগে তৈরি ক'রে ফেলতে না পারে। এখনকার ব্যস্ততার কারণ উল্টো হয়ে দাঁড়ায় ঃ আমেরিকা পরমাণু-বোমা তৈরি করবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে না-যায়। মিত্রশক্তি জার্মানীতে ঢোকার সময়ে বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানী গাউড্‌স্মিট্‌ (S. A. Goudsmit)-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ-দলও সঙ্গে ছিল,—যাঁদের কাজ ছিল অধিকৃত জার্মান গবেষণা-কেন্দ্রগুলোর কাগজপত্র পরীক্ষা ক'রে দেখা এবং আন্দাজ করা—পরমাণু-বোমা তৈরীর ব্যাপারে তা'রা কতদূর এগিয়েছে। 1945 সালের এপ্রিলে জার্মানীর প্রধানতম পরমাণু-গবেষণা কেন্দ্র মিত্রশক্তির দখলে আসে, এবং হাইজেনবার্গ্‌ বাদে শীর্ষস্থানীয় অন্য প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানীরা বন্দী হন। অল্প দিনের মধ্যেই হাইজেনবার্গকেও খুঁজে পাওয়া যায়। এইসব মূল্যবান এবং সম্মানিত বন্দীদের ইংল্যাণ্ডে একটি বিশাল এবং পরিত্যক্ত বাড়ীতে অত্যন্ত গোপনে নজরবন্দী রাখার ব্যবস্থা হয়।

1945-এর একেবারে শুরু থেকেই জিলার্ড্‌ আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইনিই আইনস্টাইনের স্বাক্ষর সংগ্রহ ক'রে মার্কিন সরকারকে সর্বপ্রথম উস্কানি দিয়েছিলেন পরমাণু-বিস্ফোরণের সামরিক প্রয়োগ সম্পর্কে ভাববার জন্য। এখন ইনি বিপরীত চেষ্টায় মেতে উঠলেন। বিখ্যাত পদার্থবিদ্‌ ফ্র্যাঙ্ক্‌ (James Frank)-এর সঙ্গে একত্রে ব'সে ইনি একটি স্মারকলিপি তৈরি করলেন, এবং পাঠিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেণ্টের কাছে। এঁদের বক্তব্য নীল্‌স্‌ বোরের পূর্ববর্তী বক্তব্যের সঙ্গে কতকটা এক হ'লেও কিছু নতুন কথাও ছিল। ভবিষ্যতে অন্যান্য বৃহৎ-শক্তির হাতে যখন পরমাণু-বোমা এসে যাবে, তখনকার যুদ্ধে আমেরিকার বিশেষ অসুবিধার কথা প্রেসিডেণ্টকে বোঝানো হয়েছিল। আমেরিকার অধিকাংশ শিল্পাঞ্চল অল্প কয়েকটি এলাকায় কেন্দ্রীভূত—সোভিয়েত রাশিয়াতে যেমনটি নয়।

অতএব, ভবিষ্যতের যুদ্ধে যখন পরমাণু-বোমা ব্যবহৃত হবে, তখন আমেরিকার বিশেষ অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে মার্কিন সরকার যেন এখনই পরমাণু-শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের দিকে জোর দেন। জাপানে পরমাণু-বোমা ব্যবহারের পরিবর্তে যা'তে আমেরিকার জনহীন কোনো অঞ্চলে একটি প্রচারমূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, এবং জাপানকে তারপরে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়—এটাও স্মারক-লিপির বিশেষ বক্তব্য ছিল। এই লিপি রুজভেল্টের টেবিলে পৌঁছোল বটে; কিন্তু সেটা প'ড়ে উঠবার আগেই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন (12ই এপ্রিল, 1945)। নতুন প্রেসিডেণ্ট্ ট্রুম্যান্ প্রেসিডেণ্টের চেয়ারে বসবার পরে ম্যান্-হাটান্ প্রোজেক্টের কথা প্রথম জানলেন। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতেই তাঁর অনেক সময় লেগে গেল, এবং পূর্ববর্তী কর্মধারার বিপরীতমুখী কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সাহস তিনি দেখালেন না; বিশেষত, সামরিক বিভাগের সম্ভাব্য ক্ষোভের কথা ভেবে। জিলার্ড্ এবং ফ্র্যাঙ্কের প্রচেষ্টা ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্টের সামরিক কর্তৃপক্ষকে যথেষ্টই বিরক্ত করেছিল।

জার্মানীর হাতে পরমাণু-বোমা না থাকার বিষয়টি যখন সুনিশ্চিত হ'ল, তখন ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্টের কিছু বিজ্ঞানীও ঐ যুদ্ধে পরমাণু-বোমা ব্যবহারের সার্থকতা সম্পর্কে নতুন ক'রে ভাবতে শুরু করলেন। এ সময়ে ঐ বোমা তৈরীর চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়েছে। এমন কি, প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে টিনিয়ান্-এ একদল বৈমানিককে গোপনে বিশেষ তালিম দেওয়া হচ্ছিল ঐ বোমা নিক্ষেপের বিষয়ে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাতুবিজ্ঞান-গবেষণাগারের বিজ্ঞানীদের ভিতরে ক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে। পরমাণু-বোমার প্রয়োগ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য তাঁরা চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু, স্বাভাবিক কারণেই এই জাতীয় ক্ষোভের কোনো উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ডটি সামরিক বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকায় কর্মীরা সকলেই আনুগত্যের সামরিক আচরণ-বিধিতে আটকে পড়েছিলেন। কিন্তু, এটাও সত্যি যে—শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা পরমাণু-বোমার প্রয়োগ সম্পর্কে সহমত ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত অনেকেই মনে করেছেন—পদার্থবিদের উচিত নয় রাজনীতিবিদের এলাকাতে কথা বলতে যাওয়া।

যুদ্ধসচিব স্টিম্সন্ 1945-এর মে-মাসে পরমাণু-শক্তি বিষয়ক একটি 'মধ্য-কালীন সমিতি' ( Interim Committee ) গঠন করলেন—যা'র সদস্য-সংখ্যা আট, এবং স্টিম্সন্ নিজেই যা'র চেয়ারম্যান্। এই সমিতির কাজ ছিল তিনটি বিষয়ে চিন্তা করা ঃ বোমা নিক্ষেপের পরে যে সব বিবৃতি দেওয়া হবে; আমেরিকাতে পরমাণু-বোমা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের খসড়া তৈরি করা; আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের

বিষয়ে সুপারিশ করা। বুশ্ এবং কোন্যাণ্ট্ তাঁদের পদাধিকারে এই সমিতির সভ্য ছিলেন। সমিতির সঙ্গে কয়েক জন যশস্বী বিজ্ঞানীর একটি উপদেষ্টামণ্ডলী (Advisory Panel) রইল, যা'র সভ্য হ'লেন কম্‌টন্, ফের্মি, লরেন্স্, ওপেন্‌হাইমার্-এর মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। 31শে মে ঐ সমিতির সঙ্গে এই মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক আলোচনা হ'ল; কিন্তু পরমাণু-বোমার প্রয়োগ-নীতি ঐ আলোচনাসূচীর বাইরে ছিল। পরের দিন (জুন 1, 1945) ঐ সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে (যদিও—উপদেষ্টা-মণ্ডলীর অনুপস্থিতিতে) জাপানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরমাণু-বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়। জাপানের কোথায় এই বোমা ফেলা হবে—তা' স্থির করার দায়িত্ব স্টিম্‌সন্‌কেই দেওয়া হয়। এর তিন সপ্তাহ পরে সমিতির অন্যতম সদস্য এবং নৌ-বিভাগের উপপ্রধান মিঃ বার্ড্ (Ralph A. Bard) নিজের ভোটটি প্রত্যাহার ক'রে নেন এই কারণ দেখিয়ে যে, জাপানে পরমাণু-বোমা ব্যবহার করা হ'লে শান্তিকামী দেশ হিসেবে আমেরিকার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে।

উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের বলা হ'ল—তাঁরা অন্যান্য সহকর্মীদের খুলে বলতে পারেন 'মধ্যকালীন সমিতি'র অস্তিত্বের কথা। কম্‌টন্ ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাতুবিজ্ঞান গবেষণাগারের পরিচালক। তিনি এই সুযোগে তাঁর বিক্ষুব্ধ সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন (জুন, 3)। দ্রুত তৎপরতায় ফ্র্যাঙ্কের নায়কত্বে একটি বিবৃতি তৈরি করা হ'ল—পরবর্তী কালে যা' 'ফ্র্যাঙ্ক্ রিপোর্ট্' নামে খ্যাতিলাভ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল—পরমাণু-বোমার প্রয়োগ সম্পর্কে ঐ গবেষণাগারের কর্মীদের মনোভাব উল্লিখিত সমিতির মাধ্যমে সরকারকে জানানো, যদিও পরমাণু-বোমা প্রয়োগের নীতির বিষয়টি সমিতির বিবেচনার বিষয় ছিল না। ফ্র্যাঙ্ক্-রিপোর্ট্ সাত জন বিজ্ঞানীর স্বাক্ষর সহ 11ই জুন পাঠানো হয়েছিল, এবং—বলা বাহুল্য—এই প্রয়াস কোনোভাবেই সার্থক হয়নি।

ইতিমধ্যে স্থির হয়—জাপানের এমন অঞ্চলে পরমাণু-বোমা নিক্ষেপ করা হবে যা' জনাকীর্ণ, যা'র সামরিক গুরুত্বও আছে এবং যে অঞ্চল ইতিমধ্যেই যুদ্ধবিদ্ধস্ত হয়নি। এই বোমার ক্ষয়ক্ষতি যা'তে সঠিকভাবে বুঝতে পারা যায় তাই ঐ শেষোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তিনটি জাপানী শহরকে 'টার্গেট্' হিসেবে বেছে নেওয়া হয়ঃ হিরোশিমা, কোকুরা এবং নিগাতা। পরে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত বদলে যায়।

'অন্তর্মুখী বিস্ফোরণ' বা 'implosion' পদ্ধতির সাফল্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কিছুটা সন্দেহ শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়ায় একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়। ঠিক হয়, জুলাই-মাসের মাঝামাঝি সময়ে নিউ মেক্সিকোর

একটি মরু-অঞ্চলে অত্যন্ত গোপনে এটি ঘটানো হবে। ইতিমধ্যে বুশ্ এবং কোন্যাণ্ট্ 'মধ্যকালীন সমিতি'কে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলেন—যা'তে পরবর্তী সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেণ্ট্ ট্রুম্যান্ আমেরিকার পরমাণু-বোমা তৈরীর বিষয়টি স্তালিনকে খুলে বলেন। বলা বাহুল্য, এই ধরনের অনুরোধই নীল্স্ বোর্ অনেক দিন আগে করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমিতি ট্রুম্যান্‌কে সুপারিশ করেন (21শে জুন)—পয়লা জুলাই জার্মানীতে স্তালিনের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎকারে বিষয়টি যেন তাঁকে জানানো হয়। ট্রুম্যান কিন্তু সাক্ষাৎকারের তারিখ পিছিয়ে নিয়ে গেলেন 15ই জুলাই। কারণ, নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের [ সাঙ্কেতিক নাম—'ট্রিনিটি' ] ফলাফল তিনি আগে জেনে নিতে চেয়েছিলেন।

পরীক্ষামূলক বোমাটি তৈরীর জন্য সব ক'টি গবেষণাগারের সমস্ত প্লুটোনিয়াম সংগ্রহ ক'রে নেওয়া হ'ল—যা' বিভিন্ন হাতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল নানা ধরনের পরীক্ষার জন্য। নির্দিষ্ট দিনে একটি গোপন রাস্তা দিয়ে বোমার যন্ত্রাংশগুলো লস্ অ্যালামোস্ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি গোপন জায়গাতে। সেখানে সম্পূর্ণ বোমাটি তৈরি করা হয়। তারপর আবার যাত্রা। মরু অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট, গোপন জায়গায় ইস্পাতের কম-বেশী একশো ফুট উঁচু একটি ফ্রেম্ তৈরি ক'রে রাখা ছিল। তারই উপরে বোমাটিকে রেখে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই জায়গা [ 'জিরো পয়েণ্ট্' ] থেকে ন' মাইল দূরের 'বেস্ ক্যাম্পে' উপস্থিত বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ ছিলেন। বোমার ছ' মাইল দূরে ছিল 'কণ্ট্রোল্ পয়েণ্ট্'; সেখান থেকে ষোলোই জুলাই বিস্ফোরণটি ঘটাবার ব্যবস্থা হয়। আবহাওয়া খুব খারাপ থাকায় বিস্ফোরণের সময়টি পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় চারটে থেকে সাড়ে-পাঁচটায়। সোয়া-পাঁচটায় সবাই কালো চশমা প'রে নিলেন। ওপেন্‌হাইমার্ শেষ মুহূর্তেও শঙ্কিত হয়ে ভেবেছিলেন—বিস্ফোরণ আদৌ হবে কি না। আর জেনারেল গ্রোভ্‌স্ দেখছিলেন—প্রয়োজনে দ্রুত পালাবার ব্যবস্থা নিখুঁত আছে কি না।—তারপর কল্পনাতীত দ্রুততায় সব কিছু ঘ'টে গেল। বিস্ফোরণের প্রথম দু'তিন সেকেণ্ড্ সবাই ছিলেন পুরোপুরি অন্ধ। শুধু আকাশ আর দূরের পাহাড়কে একদম সাদা হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। ফিলিপ্ মরিসন্ লিখেছেন: রাত্রিটা ছিল ঠাণ্ডা। মরুভূমির সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে সবাই কাঁপছিলাম, যদিও সেটা জুলাই-এর মাঝামাঝি। তারপরেই এল চোখ অন্ধ-করা নীলাভ সাদা দ্যুতি; সমস্ত মুখের উপরে সেইসঙ্গে এসে পড়ল দুপুরের সূর্যের উত্তাপ।—জনৈক জেনারেল বলেছেন: দুপুরের সূর্যের চেয়েও বহুগুণ বেশী তীব্র সেই আলো। প্রায় আধ মিনিট পরে প্রচণ্ড ঝড় বইতে শুরু করল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে এল তীব্র, ভয়ংকর, একটানা

গর্জন। যে শক্তি এতদিন শুধু সর্বশক্তিমানেরই সংরক্ষিত ছিল, আমরা—এই নগণ্য, দুর্বল মানুষেরা—অন্যায় দুঃসাহসে সেদিকে হাত বাড়িয়ে যে পাপ করেছি—তা'ই লক্ষ ক'রে ঐ গর্জন যেন আমাদের শাসিয়ে গেল।

বিস্ফোরণের সম্ভাব্য তীব্রতার যে হিসেব করেছিলেন 'তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা' বিভাগের প্রধান—হ্যান্‌স্‌ বেটে (Hans A. Bethe), তা' নিতান্ত ভুল প্রমাণিত হয়। বস্তুত ঐ তীব্রতা হয় অনেক গুণে বেশী, এবং তীব্রতা পরিমাপক অনেক যন্ত্রপাতি বিস্ফোরণের তীব্রতায় অকেজো বা নিশ্চিহ্ন হয়। প্রত্যক্ষদর্শী বহু বিজ্ঞানীর পক্ষে ঐ অভিজ্ঞতা স্নায়বিক আঘাত হয়ে দাঁড়ায়। বিস্ফোরণের আলো দেখা গিয়েছিল একশো পঁচিশ মাইল দূর থেকেও।—যাইহোক, সাঙ্কেতিক ভাষায় এই সাফল্যের তারবার্তা যায় প্রেসিডেন্ট্‌ ট্রুম্যানের কাছে। তিনি তখন জার্মানীতে গিয়েছিলেন শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে। আমেরিকা এবং ব্রিটেন সোভিয়েট নেতৃত্বকে সন্দেহের চোখেই দেখছিল, এবং 'মধ্যকালীন সমিতি' ট্রুম্যান্‌কে যে সুপারিশ করেছিল স্তালিনকে সব কিছু খুলে বলার জন্য—তা' নিশ্চয়ই ট্রুম্যান্‌ প্রসন্নভাবে নিতে পারেননি। বস্তুত, বিস্ফোরণের সাফল্য-সংবাদে পুলকিত ট্রুম্যান্‌ 24শে জুলাই কথা প্রসঙ্গে স্তালিনকে বলেন—আমাদের হাতে দারুণ অস্ত্র আছে, যা' দিয়ে অনায়াসে যুদ্ধ জেতা যায়। স্তালিন কিছু না বুঝে সহজভাবেই বলেন—তবে সেটা জাপানে প্রয়োগ করুন।…ট্রুম্যান্‌ আর কথা বাড়ালেন না। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার যে মহৎ উদ্দেশ্যে ট্রুম্যান্‌কে ঐ সুপারিশ করা হয়েছিল, তা' সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল।

'ট্রিনিটি'র পরেও জিলার্ড্‌ শেষ চেষ্টা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার। শিকাগোর গবেষণাগারের আটষট্টিজন কর্মীর স্বাক্ষর সহ একটি আবেদনপত্র তিনি তৈরি করেন 17ই জুলাই। এর একটি প্রাথমিক খসড়া একজন বিজ্ঞানী মারফত 1লা জুলাই পাঠানো হয় প্রধান কর্মকেন্দ্র লস্‌ অ্যালামোস্‌-এ—সেখানকার জনমতকে কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু, ওপেন্‌হাইমার্‌ লস্‌ অ্যালামোস্‌-এ ঐ আবেদনপত্রের প্রচার নিষিদ্ধ ক'রে দেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন—এটা সামরিক কর্তৃপক্ষের নজরে এলে জটিল অবস্থা সৃষ্টি হবে। জিলার্ডের আবেদনপত্রের একটি 'কপি' আসে জেনারেল গ্রোভ্‌স্‌-এর হাতে; অন্যটি যায় প্রেসিডেন্টের কাছে। গ্রোভ্‌স্‌ এই পত্রকে 'গোপন দলিল' হিসেবে চিহ্নিত করেন। আইনত, এ জাতীয় দলিল স্থানান্তরের সময়ে সঙ্গে রক্ষী থাকা দরকার। গ্রোভ্‌স্‌ লিখে রাখলেন—তাঁর হাতে এখন যথেষ্ট সংখ্যক রক্ষী না থাকায় ওটি নিরাপদে তালাবন্ধ ক'রে রাখা হ'ল। ট্রুম্যান্‌ এ ব্যাপারে সামরিক বিভাগের সুপারিশ ডিঙিয়ে কিছু করবেন না—এটা প্রায় নিশ্চিত ছিল।

জাপানে পরমাণু-বোমা নিক্ষেপের বিষয়টি যখন সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে, তখন বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বিচিত্র নানা প্রস্তাব আসতে থাকে। একটি প্রস্তাব ছিল ঃ পরমাণু-বোমার সঙ্গে যেন প্রচুর সংখ্যক প্রচার-পুস্তিকাও ফেলা হয়—যা'তে তেজস্ক্রিয়তাজনিত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হবে। কিন্তু, সামরিক বিভাগ এ প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে অগ্রাহ্য করেন। প্রসঙ্গক্রমে জেনারেল গ্রোভ্স্ একবার বিজ্ঞানীদের সভায় প্রকাশ্যভাবেই বলেছিলেন, 'আমি যতদূর জানি—তেজস্ক্রিয় রশ্মির ফলে যে মৃত্যু হয় তা অত্যন্ত মনোরম ('very pleasant')।'…পরমাণু-বোমার ক্ষতিকর ক্রিয়া সম্পর্কে ঐ সময়ে বিজ্ঞানীদেরও ধারণা পরিষ্কার ছিল না। তেজস্ক্রিয়তা সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ হবে ব'লে তাঁরা আন্দাজ করতেন।

'ট্রিনিটি'র পরেই হ্যান্‌ফোর্ড্ থেকে প্লুটোনিয়ামের নতুন চালান লস্ অ্যালামোস্-এ এসে পেঁছোয়। [ বস্তুত, প্লুটোনিয়াম আনা হয় প্লুটোনিয়াম-নাইট্রেট্ হিসেবে, যা' পরে প্লুটোনিয়াম-ধাতুতে পরিণত ক'রে নেওয়া হয়। ] টিনিয়ান্-এ শিক্ষারত বৈমানিকদের জানিয়ে দেওয়া হয় আগস্টের প্রথম দিকে প্রস্তুত থাকতে। একদল বিজ্ঞানী টিনিয়ান্-এ চ'লে যান প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নিয়ে—সেখানেই বোমার গঠন সম্পূর্ণ করবার জন্য। 6ই আগস্ট সকালে হিরোশিমাতে প্রথম বোমাটি ফেলা হয়। এটি ইউরেনিয়াম-বোমা ; তথাকথিত বন্দুক-প্রণালীতে কার্যকর করা হয়। বোমাটির সাংকেতিক নাম ছিল 'লিট্‌ল্ বয়্'। দশ ফুট লম্বা ; প্রশস্ততম অংশে 28 ইঞ্চি চওড়া ; ওজনে 9000 পাউন্ড্ ( চার টনের কিছু বেশী ) ; শক্তিতে 16 কিলোটন (মতান্তরে 12·5 কিলোটন) TNT-র সমান। ন' তারিখে নাগাসাকির উপরে নিক্ষিপ্ত হয় প্লুটোনিয়াম-বোমাটি। এর সাংকেতিক নাম 'ফ্যাট্ ম্যান্' ; সাড়ে-দশ ফুট লম্বা ; প্রশস্ততম অংশে পাঁচ ফুট চওড়া ; ওজনে 10000 পাউন্ড্ (সাড়ে-চার টনের কিছু বেশী) ; শক্তিতে 22 কিলোটন TNT-র সমান। উচ্চতর শক্তির হ'লেও নাগাসাকির বোমাটিতে ক্ষতির পরিমাণ হয় তুলনামূলকভাবে কম। সম্ভবত, আংশিক লক্ষ্যভ্রষ্টতা এর কারণ।

ইংল্যাণ্ডের এক পোড়ো বাড়ীতে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা রেডিওতে শুনলেন জাপানে অভিনব অস্ত্র প্রয়োগের খবর 6 তারিখেরই বিকেলে। ওই অস্ত্র সত্যিই পরমাণু-বোমা কি না, তা' নিয়ে কিছু তর্ক হ'ল তাঁদের নিজেদের ভিতরে। কিন্তু, পরবর্তী বেতার-সংবাদে যখন ধ্বংসের একটা আনুমানিক হিসেব দেওয়া হ'ল, তখন আর সন্দেহ রইল না। সবচেয়ে বেশী স্নায়বিক আঘাত পেয়েছিলেন অটো হান্। এই প্রবীণ বিজ্ঞানী পরমাণু-বোমার অস্তিত্বের জন্য নিজেকেই মূলতঃ দায়ী মনে করেছিলেন। অন্তরীণ তরুণ বিজ্ঞানীরা সমস্ত

দিন-রাত তাঁকে সতর্ক দৃষ্টিতে রাখতেন। তাঁদের সন্দেহ ছিল—হান্‌ হয়তো আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারেন।

প্রথম সারির এই জার্মান বিজ্ঞানীদের তখনকার মনোভাব আমাদের অনুমানের বিষয়। জার্মানীতে মিত্রশক্তি ঢোকার পরে যে সব কাগজপত্র আটক করা হয়, তা' পরীক্ষা ক'রে বোঝা যায়—যুদ্ধের সময়ে জার্মান বিজ্ঞানীরা ইচ্ছা ক'রেই পরমাণু-বোমা তৈরির চেষ্টা করেননি। তাঁরা চেষ্টার ভান করেছেন হিটলারকে বিভ্রান্ত করবার জন্য। স্বদেশপ্রেমের উপরে সত্যিকার মানবপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরাই। অবশ্য, চেষ্টা করলেও জার্মানীর পরাজয়ের আগেই তাঁরা পরমাণু-বোমা তৈরীর কাজ শেষ করতে পারতেন কি না, তা' আজও তর্কের বিষয়।*

---

* পরমাণু বোমা তৈরীর ইতিহাস যাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে চান, তাঁরা বিশেষভাবে এই বইগুলোর সাহায্য নিতে পারেন ঃ

Henry D. Smyth : A General Accounting of Methods of Using Atomic Energy for Military Purposes under the Auspices of the United States Government (Govt. Printing Office ; Washington, D.C.; 1945)

R. G. Hewlett & O. E. Anderson : The New World (Vol. 1) (Pennsylvania State University Press ; 19੦2).

L. Lamont : The Day of the Trinity (Atheneum, N. Y ; 1965)

S. Groueff : Manhattan Project : The Untold Story of the Making of the Atomic Bomb (Little, Brown & Co., Boston ; 1967).

R. Jungk : Brighter Than a Thousand Suns (Harcourt, Brace & World, N. Y. ; 19:8).

## চার / ক্ষয়ক্ষতি প্রসঙ্গ

পরমাণু-বোমার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ অংশে। এই পরিচ্ছেদে ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে আমরা আরও বিস্তৃত-ভাবে পরিচিত হব। একটা কথা প্রথমেই মনে রাখা দরকার ঃ আমরা বিভিন্ন কারণে ক্ষয়ক্ষতির কথা আলাদা ভাবে বললেও বাস্তবে সবগুলো ক্রিয়া প্রায় একসঙ্গেই ঘটে, এবং এদের সম্মিলিত ফল স্বতন্ত্র ফলের যোগফলের তুলনায় অনেক বেশী হয়। কিন্তু প্রথমেই সাধারণ আলোচনা আমরা শুরু করতে চাই না। বরং আমরা পিছিয়ে যাই 1945 সালের 6ই আগস্টের সকালে হিরোশিমার রাজ-পথে। সেই অভিশপ্ত সকালে যাঁরা মুক্ত আলোয় শহরের পথে বা'র হয়েছিলেন, অথচ শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পড়েন নি, তেমন একজন মহিলার মুখ থেকে শোনা যাক সেই সকালের বর্ণনা। মিসেস্ ফুতাবা কিতায়ামার বয়স তখন তেত্রিশ। আটত্রিশ বছর পরে তিনি স্মৃতিচারণ করছেন :

'৬ই আগস্টের সেই সকালে আমি হিরোশিমায় ছিলাম। আমার মতো মেয়েদের একটি স্বেচ্ছাসেবকের দলে আমি কাজ করছিলাম ; অগ্নিবর্ষী বিমান-আক্রমণের মোকাবিলায় এক সারি ঘর-বাড়ি ভেঙে আগুনের বাধা তৈরি ক'রে দিচ্ছিলাম। আগের রাত্রে বিমান-আক্রমণের একটি পূর্বাভাষ থাকায় আমার স্বামী 'চুনিচি' ( জাপানের সংবাদপত্র )-তে থেকে গিয়েছিলেন—যেখানে তিনি কাজ করতেন।

'আমাদের দলটি এক-একজন ক'রে জুরুমি-সেতু পার হ'ল,—তখনই এল সাবধান-বাণী : শত্রুদের একটি এরোপ্লেন একাই হাজির হয়েছে,—অনেক উঁচুতে আমাদের মাথার উপরে। তা'র রুপালী ডানা সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল : 'দেখ—প্যারাসুট্।'…সে যেদিকে দেখাচ্ছিল আমি সেই দিকে ঘুরলাম, আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বিধ্বংসী ঝলকানিতে সারা আকাশ ভ'রে গেল।

'ঝলকানিই কি প্রথম এসেছিল, না কি আমার অন্তস্থল ছিড়ে দেওয়া বিস্ফোরণের শব্দ ? আমি মনে করতে পারি না। আমি ছিট্‌কে পড়লাম মাটিতে, মাটিতে এঁটে রইলাম, আর তৎক্ষণাৎ পৃথিবী ধ্বসে পড়ল আমার চারিদিকে ; আমার ঘাড়ে, আমার মাথায়। আমি কিছু দেখতে পারছিলাম না ;

ধ্বংসস্তূপ ক্রমাগত পড়ছিল। আমার উপরে কড়ি-বর্গা আর টালি স্তূপাকার হয়ে গেল।

'শেষ অবধি আমি হামাগুড়ি দিয়ে কোনোমতে ছাড়া পেলাম। বাতাসে ছিল একটা ভয়ংকর গন্ধ। যে বোমাটা পড়েছে, সেটা হলদে ফস্‌ফোরাসের আগুনে বোমা হ'তে পারে—যা' অন্য অনেক শহরেই পড়েছে—এই ভেবে আমার কোমরের 'তেনুগুই' (তোয়ালে) দিয়ে আমার নাক আর মুখ রগ্‌ড়ে মুছে নিলাম। আতঙ্কিত হয়ে দেখি—তোয়ালের সঙ্গে আমার মুখের চামড়া উঠে এসেছে। ওঃ; আমার হাতের চামড়াও খুলে এল! কনুই থেকে আঙুলের ডগা অবধি—আমার ডান হাতের পুরো চামড়া আল্‌গা হয়ে বীভৎসভাবে ঝুলতে লাগল। খুলে এল বাঁ হাতের চামড়াও। পাঁচ আঙুলের চামড়া খুলে দস্তানার মতো দেখাতে লাগল।

'আমি মাটিতে ঘাড় গুঁজে বসেছিলাম। ধীরে ধীরে বুঝলাম—আমার সঙ্গী সাথীরা সব অদৃশ্য হয়েছে। ওদের কী হ'ল? উদ্দাম আতঙ্ক আমাকে চেপে ধরল; আমি দৌড়োতে চাইলাম, কিন্তু যাব কোথায়? আমার চতুর্দিকে কেবল ধ্বংসস্তূপ; কাঠের নানা কাঠামো, কড়ি-বর্গা, ছাদের টালি,—পথচিহ্ন কিছু আর নেই।

'আর—আকাশটার কী হ'ল, একটু আগেই যে এত নীল ছিল? এখন সে রাত্রির মতো কালো। সব কিছুই ঠেকছিল আবছা আর অস্পষ্ট। যেন মেঘে ঢাকা ছিল আমার চোখ; হতভম্ব হয়ে ভাবলাম—আমার বোধশক্তি বোধহয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমি জুরুমি-সেতুটা দেখতে পেলাম, এবং সোজা দৌড়োলাম তা'র দিকে—ইট-কাঠের স্তূপ ডিঙিয়ে। সেতুর নীচে যা' দেখলাম তা'তে ভীষণ ভয় পেলাম।

'শ'য়ে শ'য়ে লোক নদীতে দাপাদাপি করছে। তা'রা পুরুষ, না—মেয়ে, বলতে পারি না; সকলের অবস্থা একই রকম: মুখ ফোলা—নরম এবং ছাই-এর মতো; চুল এলোমেলো, হাত উপরে তোলা; যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে আর ঝাঁপ দিচ্ছে জলে। আমারও দারুণ জোরালো ইচ্ছা হ'ল জলে নামতে; কারণ, সারা শরীর যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, সাঁতার জানি না; তাই পিছিয়ে এলাম।

'সেতু পেরিয়ে পিছনে চেয়ে দেখতে পেলাম—সমস্ত হাচোবোরি-জেলায় আগুন লেগেছে। আশ্চর্য হ'লাম; কারণ—আমি ভেবেছিলাম, আমি যে জেলায় আছি কেবল সেখানেই বোমা পড়েছে। দৌড়োতে দৌড়তে আমি আমার বাচ্চাদের নাম ধ'রে ডাকতে লাগলাম। কোথায় আমি চলেছিলাম? কোনো ধারণা ছিল

না আমার ; কিন্তু, আমার পথে দেখা যত্রতত্র ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো আমি এখনও দেখতে পাই।

'মুখ আর ঘাড়ে রক্তের আবরণ নিয়ে একটি মা উন্মাদের মতো একটা জ্বলন্ত বাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টা করছিল। যখন একটি লোক তা'কে ধ'রে রেখেছিল, সে আর্ত চীৎকারে বলছিল—'যেতে দাও, আমাকে যেতে দাও। আমার ছেলে ওর ভিতরে পুড়ছে।' ক্ষিপ্ত দৈত্যের মতো হয়ে গিয়েছিল সে। কোজিন-সেতু অর্ধেক ভেঙে পড়েছিল ; জোরালো কংক্রিটের ধারগুলো ভেঙে গিয়েছিল তা'র। তা'র নীচে উলঙ্গপ্রায়, শতছিন্নবস্ত্র প্রচুর লোককে মরা কুকুরের মতো ভাসতে দেখলাম। নদীর ধারে, তীরের কাছে, একটি মহিলা চিৎ হয়ে পড়েছিল,—রক্তস্নাতা ; তা'র স্তন দুটো ছিঁড়ে এসেছে। এই ভয়ংকর ব্যাপার কীভাবে ঘটতে পারল ? আমার মনে পড়ল—বৌদ্ধ নরক-দৃশ্যের বর্ণনা, যা' আমার ঠাকুমা আমাকে ছোটবেলায় বলেছিলেন।

'ইস্টার্ন্ মিলিটারি প্যারেড্ গ্রাউন্ডে পোঁছোবার আগে আমি নিশ্চয়ই অন্তত দু'ঘণ্টা ঘুরেছিলাম। পুড়ে যাওয়ায় আমার যন্ত্রণা হচ্ছিল; কিন্তু, সাধারণ পোড়ার যন্ত্রণা থেকে এটা ছিল আলাদা। এ এক অগভীর যন্ত্রণা—যা' আমার শরীরের বাইরে থেকে কোনোভাবে আসছে ব'লে আমার মনে হচ্ছিল। আমার হাত দু'টো থেকে এক রকমের হলদে পুঁজ ফেনিয়ে উঠছিল। আমার মনে হ'ল—আমার মুখটাও দেখতে নিশ্চয়ই ভয়ংকর হয়ে থাকবে।

'প্যারেড গ্রাউন্ডে আমার চারপাশে গ্রেড্ স্কুল্ এবং সেকেন্ডারি স্কুলের অনেক ছেলেমেয়ে ছিল,—শ্বাসকষ্টের যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছিল তা'রা। আমার মতো তারাও বিমান আক্রমণ মোকাবিলা বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক। শুনলাম—তা'রা 'মা' 'মা' বলে' চীৎকার করছে উন্মাদের মতো। এরা এমনভাবে পুড়েছিল আর রক্তাক্ত হয়েছিল যে তাদের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। আমি কোনোমতে তাদের দিকে চেয়ে রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কেন ? এই বাচ্চাদের এমন হ'ল কেন ?' কিন্তু, সেখানে এমন কেউ ছিল না, যা'র উপরে রেগে যাওয়া যায়। আমি কিছুই করতে না পেরে তাদের মারা যেতে দেখলাম—এক একজন ক'রে ; বৃথা তা'দের মা-দের ডাকতে ডাকতে।

'প্যারেড গ্রাউন্ডে দীর্ঘকাল অচেতনপ্রায় হয়ে প'ড়ে থেকে আমি আবার হাঁটা আরম্ভ করলাম। আমার বিলীয়মান দৃষ্টিশক্তি দিয়ে যতটুকু আমি দেখতে পেলাম—সমস্ত কিছুই জ্বলছে, হিরোশিমা স্টেশন এবং আতাগো-জেলা পর্যন্ত। মনে হচ্ছিল, আমার মুখটা আস্তে আস্তে শক্ত হচ্ছে। সাবধানে হাত দিয়ে আমার গাল ছুঁলাম। ছুঁয়ে মনে হ'ল—আমার মুখটা আকারে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট

দেখার ক্ষমতা আমার ক্রমশ কমে আসছিল। তবে কি আমি অন্ধ হ'তে চলেছি? এত সংগ্রামের পরেও আমাকে কি মরতে হবে? কোনোক্রমে হাঁটা চালিয়ে আমি শহরতলির একটি এলাকায় পোঁছোলাম।

'সেই জেলাতে—কেন্দ্র অঞ্চল থেকে আরও দূরে স'রে গিয়ে—আমার দিদিকে আমি জীবিত দেখতে পেলাম; তা'র মাথায় আর পায়ে সামান্য ক্ষত। সে প্রথমে আমাকে চিনতে পারেনি; তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। হাতে-টানা গাড়ীতে সে আমাকে প্রায় তিন মাইল টেনে নিয়ে গেল ইয়াগায় প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রে। আমরা পোঁছেছিলাম রাত্রে। পরে আমি জেনেছিলাম—সেখানে স্তূপাকার মৃতদেহ এবং অগণিত আহত লোক ছিল। অচৈতন্য হয়ে সেখানে আমি দু'রাত্রি কাটালাম। আমার দিদি বলেছিল—আমি না কি আচ্ছন্নতায় বলেই চলেছিলাম, 'আমার বাচ্চারা! আমাকে বাচ্চাদের কাছে নিয়ে চলো।'

'৮ই আগস্ট আমাকে স্ট্রেচারে ক'রে ট্রেনে তুলে নিয়ে যাওয়া হ'ল কাপুমি-গ্রামে আত্মীয়দের বাড়ীতে। গ্রামের ডাক্তার বলল—আমার আর আশা নেই। আমার ছেলেমেয়েরা খবর পেয়ে তা'দের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ছুটে এল আমার কাছে। আমি তা'দের আর দেখতে পাচ্ছিলাম না; তা'দের চিনতে পারলাম কেবল তা'দের সুঘ্রাণে। ১১ই আগস্ট আমার স্বামীও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ছেলেমেয়েরা আনন্দে কেঁদে তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

'আমাদের সুখ তাড়াতাড়ি ফুরোলো। কোনো আঘাতের চিহ্ন না-থাকলেও আমার স্বামী তিন দিন পরে হঠাৎ মারা গেলেন রক্তবমি ক'রে।...

'নিজের মনে আমি বললাম—'আমার ছেলেমেয়েরা! তোমাদের জন্যই আমার মারা যাবার অধিকার নেই।' এবং শেষ পর্যন্ত আমি অলৌকিকভাবে বাঁচলাম, যদিও অনেকবার আমার আশা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

'আমার দৃষ্টিশক্তি মোটামুটি তাড়াতাড়িই ফিরে এল; কুড়ি দিন পরে আমাদের ছেলেমেয়েদের চেহারা আমি আবছা দেখতে পেলাম। আমার মুখ আর হাতের পোড়া কিন্তু অত সহজে সারল না; ক্ষতগুলো পচা টোমাটোর মতো নরম হয়ে রইল। ডিসেম্বরের আগে আমি আবার হাঁটতে পারলাম না। জানুয়ারী মাসে যখন আমার ব্যাণ্ডেজ্ খোলা হ'ল, আমি জানতে পারলাম—আমার মুখ এবং হাত বরাবরের জন্য বিকৃত হয়ে রইল। আমার বাঁ-কান অর্ধেক ছোট হয়ে দাঁড়াল। আমার হাতের সমান চওড়া একটি রক্তাভ স্রোত-চিহ্ন আমার মাথার পাশ থেকে মুখের উপর দিয়ে গলা অবধি চ'লে এসেছে। আমার ডান হাতে ও রকম দু'ইঞ্চি চওড়া ডোরা তৈরী হয়ে গিয়েছে কব্জি থেকে ক'ড়ে আঙুল পর্যন্ত। আমার বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুলের গোড়া গ'লে গিয়ে শক্ত হয়ে লেগে আছে।'...

দীর্ঘ উদ্ধৃতি শেষ হ'ল। খুব সংক্ষিপ্ত এবং এক-নজরে-দেখা হ'লেও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে আমাদের খানিকটা পরিচয় হ'ল। এবারে আমরা সাধারণভাবে কিছু আলোচনায় আসতে পারি। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে আমরা বলেছিলাম বিস্ফোরণের ফলে নির্গত সম্পূর্ণ শক্তি প্রথমে গৃহীত হয় বাতাসের একটি ক্ষুদ্র, গোলাকার অঞ্চলে। এই অঞ্চলের উত্তাপ এবং চাপ তখন সূর্যের কেন্দ্র-অঞ্চলের তুল্য হয়ে দাঁড়ায়। [এক মেগাটন বোমার বিস্ফোরণে যে শক্তি প্রকাশ পায়, তিন কোটি গ্যালন পেট্রোল পুড়লে তা'র সমান হ'তে পারে। মাত্র কয়েক ঘনফুট জায়গাতে মুহূর্তে এটা ঘটলে সূর্যের অন্তস্থল পৃথিবীতে নেমে আসবেই।] যদিও ঐ গোলকের অতি দ্রুত প্রসারণের ফলে ঐ উত্তাপ কয়েক মিলিসেকেণ্ডের মধ্যেই নেমে কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে দাঁড়ায়।

পরমাণু-বিস্ফোরণে দু'ধরনের 'রশ্মি' বা'র হয়ে আসে। 'তাৎক্ষণিক বিকিরণ' (prompt radiation),—যা'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ গামা-রশ্মি ও নিউট্রন; এবং তাপ-রশ্মি (thermal radiation)। উচ্চশক্তির (মেগাটন-শক্তির) বোমার ক্ষেত্রে তাপ-রশ্মির ক্ষতিকর ক্রিয়া অনেক বেশী ব্যাপক। এক-মেগাটন বোমার ক্ষেত্রে নির্গত মোট শক্তির শতকরা অন্তত চল্লিশ ভাগই উত্তাপ এবং আলো হিসেবে দেখা দেয়। এক সেকেণ্ডের ভিতরেই তীব্র আলো এবং উত্তাপ ঐ অঞ্চলের ঘর-বাড়ী, গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদির উপরে এসে পড়ে এবং বোমার শক্তি, দূরত্ব, মধ্যবর্তী আড়াল এবং আবহাওয়া অনুসারে কম-বেশী ক্ষতি করে। এ ক্ষেত্রে "ক্ষতি করা" বলতে—পুড়ে যাওয়া বা আগুন ধ'রে যাওয়া। হিরোশিমাতে বিস্ফোরণের এক মাইলের মধ্যে সমস্ত পথচারীর শরীর কম-বেশী পুড়ে গিয়েছিল। জানালা-দরজার পর্দায়, হাল্কা পোশাকে আগুন ধ'রে গিয়েছিল। তীব্র দ্যুতিতে ধাঁধিয়ে যাওয়ায় কয়েক সেকেণ্ড কেউ নড়াচড়া করতে পারে নি। মানুষ ও অন্য প্রাণীদেহের অনাবৃত চামড়া পুড়ে যাবার সময়ে মধ্যবর্তী আড়ালের ছায়ার জ্যামিতিক চেহারাও চামড়ায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে। একজনের নাকের ছায়া অন্যের দেহে স্থায়িভাবে আঁকা হয়ে যায়। একটি ঘোড়া লোহার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়েছিল। ঘোড়ার শরীরের চামড়া পুড়ে যায়; কিন্তু, রেলিং-এর ছায়া তা'র দেহে সুস্পষ্ট আঁকা থাকে,—অর্থাৎ, ঐ ছায়াটুকুতে তা'র চামড়া পুড়ে যায়নি। একটি মেয়ের শরীরে কিমোনোর কারুকার্য ফুটে ওঠে তা'র চামড়া পুড়ে গিয়ে। গাঢ় রং-এর ডিজাইন ছিল হাল্কা রং-এর কিমোনোর উপরে। গাঢ় রং বেশী তাপ শুষে নেয় এবং শরীরের সংলগ্ন চামড়া পুড়িয়ে কারুকার্য স্থায়ী ক'রে দেয়। এগুলো বিস্ফোরণের কয়েক দিন পরে প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিন বিজ্ঞানীর বর্ণনা। সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্রও পরবর্তী কালে প্রচুর

প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, হিরোশিমার বোমা মাত্র ষোলো (মতান্তরে 12·5) কিলোটনের বোমা,—যদিও তা'তেই দু'লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। মেগাটন-শক্তির বোমাতে তাপ-রশ্মির ক্ষতি অত্যন্ত ব্যাপক। নীচের তালিকায় বিভিন্ন শক্তির পরমাণু-বোমার ক্ষেত্রে তাপ-রশ্মির ক্ষতিকর দূরত্বসীমা নির্দেশ করা হ'ল। এই সীমানার ভিতরে কাগজ, কাপড়, পাতা-কাঠ (plywood) জ্বলে উঠবে, এবং মানুষের চামড়া গভীরভাবে পুড়ে যাবে—যদি কোনো মধ্যবর্তী আড়াল না থাকে এবং আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে। (কুয়াশা থাকলে এই ধরনের ক্ষতি অনেক কম হয়।) দূরত্বগুলো সবই 'তির্যক দূরত্ব',—অর্থাৎ, বিস্ফোরণ কেন্দ্র থেকেই এদের বিবেচনা করা হয়েছে। তুলনার জন্য তৃতীয় স্তম্ভে তাৎক্ষণিক বিকিরণের ক্ষতির সীমানাও নির্দেশ করা হ'ল। এই সীমানার ভিতরে সম্পূর্ণ শরীরে যাঁরা এই বিকিরণ (গামা-রশ্মি ও নিউট্রন) গ্রহণ করবেন, তাঁদের অর্ধেক ব্যক্তির মৃত্যুর সম্ভাবনা।

| বোমার শক্তি | তাপ-রশ্মির বিপদসীমা | নিউট্রন ও গামা-রশ্মির বিপদসীমা |
|---|---|---|
| 1 কিলোটন | 0·5 মাইল | 0·5 মাইল |
| 10 ,, | 1·4 ,, | 0·8 ,, |
| 100 ,, | 2·5 ,, | 1·1 ,, |
| 1 মেগাটন | 10 ,, | 1·5 ,, |
| 10 ,, | 23 ,, | 2·3 ,, |

(এই সারণীর তথ্য বাস্তব পরীক্ষার ভিত্তিতেই গৃহীত।)

তাপ-রশ্মিতে মানুষের শরীরে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় চোখ। সংহতকারী বৈশিষ্ট্যের (focussing property-র) জন্যই চোখের ক্ষতি হয় খুব বেশী। বিস্ফোরণের আলো সোজাসুজি যাঁদের চোখে এসে পড়বে, তাঁদের তো কথাই নেই; যাঁরা অন্য দিকে তাকিয়ে এর প্রতিফলিত আলো গ্রহণ করবেন—তাঁদেরও চোখের সাময়িক অন্ধত্ব এবং স্থায়ী কিছু ক্ষতি হওয়া খুবই সম্ভব।

তাপ-রশ্মির অগ্নিকাণ্ড উপরের আলোচনা থেকে যতটা বিপজ্জনক ব'লে মনে হ'তে পারে, বাস্তবে তা'র চেয়ে অনেক বেশী হয়। কারণ, তাপ শোষণের পালা চলতে থাকে বেশ কয়েক সেকেণ্ড্ পর্যন্ত,—যা'র ভিতরেই এসে পৌঁছে যায় 'ঘাত-তরঙ্গ'—যা'র কথা প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে আমরা সংক্ষেপে বলেছি। এর ধাক্কায় রীতিমতো মজবুত ঘর-বাড়ীও ভেঙে পড়ে; ঘনবসতি অঞ্চল গুঁড়িয়ে লণ্ডভণ্ড

হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 14·7 পাউণ্ড। বাড়তি পাঁচ পাউণ্ড চাপ সৃষ্টি হ'লেই সাধারণ ঘর-বাড়ী ভেঙে পড়ে। এই পরিমাণ বাড়তি চাপ এক মেগাটনের বিস্ফোরণে প্রায় তিন মাইল দূরেও টের পাওয়া যায়। বিস্ফোরণ বেশ কিছুটা উপরে ঘটালে (প্রায় 10,000 ফুট) এই সীমানা আরও বেড়ে যায় (এবং এটা চিন্তা ক'রেই হিরোশিমা এবং নাগাসাকির বিস্ফোরণ মাটির খুব কাছে ঘটানো হয়নি)। কংক্রিটের কঠিনতম গঠন ভেঙে ফেলতে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 50 থেকে 100 পাউণ্ড বাড়তি চাপেরও দরকার হ'তে পারে। এক মেগাটনের বিস্ফোরণে আধ মাইলেরও বেশী দূরত্ব পর্যন্ত এটা সম্ভব। প্রায় পাঁচ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে তুলে ঐ ঝড়ের হাওয়া নিকটবর্তী দেয়ালে আছাড় মারতে পারে মাধ্যাকর্ষণের বলের বহুগুণ বেশী জোরে। গুঁড়িয়ে যাওয়া শহরের কাচের টুকরো, ধাতুর খণ্ড—সবই উড়তে থাকে ঘণ্টায় একশো মাইলের বেশী বেগে। অনেক গাছ উপ্‌রে যায়; অত্যন্ত ভারী গাড়ীও উল্টে যেতে পারে। এই অবস্থাতে তাপ-রশ্মির তাণ্ডবলীলা স্বভাবতই প্রচণ্ডতর হয়। যে সব সহজদাহ্য বস্তু সাধারণত ঘরের ভিতরেই থাকে, তা' বাইরের খোলা জায়গাতে এসে পড়ায় আগুনের বিশেষ সুবিধা হয়। তা' ছাড়া, ভেঙে-যাওয়া গ্যাস্‌-পাইপ, উল্টে-যাওয়া স্টোভ্‌, ফেটে-যাওয়া পেট্রোল-ট্যাঙ্ক্‌—এ সবের বিশেষ ভূমিকা তো আছেই। শেষ পর্যন্ত পুরো শহরটাই তাই নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়, এবং এই কুণ্ডের উত্তাপে সীমান্তবর্তী অঞ্চলও জ্বলে ওঠার ফলে এর বিস্তৃতি দ্রুত বাড়তে থাকে।

নীচের সারণীতে ঘাত-তরঙ্গের ক্ষতিকর ক্রিয়ার দূরত্বসীমা নির্দেশ করা হ'ল। এ ক্ষেত্রেও—বলা বাহুল্য—মধ্যবর্তী আড়াল থাকা না-থাকার উপরে ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে। অবশ্য, এখানে ছোটখাট আড়ালের কোনো মূল্য নেই।

| বোমার শক্তি | কাঠের ঘর-বাড়ী ধ্বংসের দূরত্বসীমা | মানুষের পক্ষে বিপদসীমা (খোলা জায়গায়) |
|---|---|---|
| 1 কিলোটন | 0·6 মাইল | 0·3 মাইল |
| 10 ,, | 1·4 ,, | 0·8 ,, |
| 100 ,, | 2·8 ,, | 1·9 ,, |
| 1 মেগাটন | 6·4 ,, | 4·8 ,, |
| 10 ,, | 13·7 ,, | 12·0 ,, |

ঘাত-তরঙ্গের দ্রুতগতি ভ্রমণের কথা প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে আমরা বলেছি। এই

গতি অবশ্যই শব্দোত্তর গতি। একটি 1 মেগাটন বোমার বিস্ফোরণে উদ্ভূত অগ্নি-গোলকটি সর্বাধিক আকারে [ প্রায় 5700 ফুটের ব্যাস ] আসতে সময় লাগে প্রায় দশ সেকেন্ড, যে সময়ে ঘাত-তরঙ্গের সীমা আরও তিন মাইল দূরে এগিয়ে যায়। বিস্ফোরণের 50 সেকেন্ড পরে এই তরঙ্গ 12 মাইল অবধি চ'লে যায়, এবং এই অবস্থায় এর গতিবেগ হয় সেকেন্ডে প্রায় 1150 ফুট—অর্থাৎ, শব্দের গতির চেয়ে সামান্য বেশী।

তাৎক্ষণিক বিকিরণের ( অর্থাৎ, গামা-রশ্মি ও নিউট্রনের ) ক্ষতিকর ক্রিয়ার কথা আমরা ইতিমধ্যেই একাধিকবার উল্লেখ করেছি। এই ধরনের বিকিরণে মানুষের কী ক্ষতি হয়—সে বিষয়ে দু'একটি কথা বলা দরকার। উচ্চশক্তির সাধারণ পরমাণু-বোমাতে এই বিকিরণের ভূমিকা সবচেয়ে বড়ো না হ'লেও এর প্রভাবে বহু লোকের মৃত্যু অথবা অন্যান্য অনেক মারাত্মক ক্ষতি সম্ভব। নিউট্রনের ভূমিকা গামা-রশ্মির তুলনায় গৌণ,—যদিও বিশেষ ধরনের আধুনিক কিছু বোমার কথা আলাদা ( নিউট্রন-বোমা ইত্যাদি )। গামা-রশ্মি, এক্স্-রশ্মি ইত্যাদি তীব্র বিকিরণের যাত্রাপথে যে অণু-পরমাণু পড়ে, তা'রা বিশেষভাবে আয়নিত হ'তে পারে ; অর্থাৎ—পারমাণবিক গঠনে বহির্সজ্জা আংশিক বা সম্পূর্ণ ভেঙে যেতে পারে। এর ফলে অত্যন্ত সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হওয়া সম্ভব। আমাদের শরীরের ভিতরে গামা-রশ্মি ঢোকার ফলে যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন শরীরের নানা মৌলিক ক্ষতি হয়। শরীরের 'কোষ' ( cell )-এর প্রোটিন্ ভেঙে যায়, এবং জলের ( বা $H_2O$-র ) কিছুটা ভেঙে তীব্র ক্রিয়াশীল HO এবং H আয়ন ( বিদ্যুৎবাহী কণা ) তৈরী হয়। চূড়ান্ত ফল হিসেবে—ঐ কোষগুলোর স্বাভাবিক কাজ বন্ধ হয়। অবশ্য, তথাকথিত 'আয়নিত' হওয়া এবং প্রাণ-কোষের মৃত্যুর সঠিক সম্পর্কটা পুরোপুরি বোঝা যায় নি। এই ধরনের ঘটনা ঘটতে এক সেকেন্ডের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ও লাগে না, যদিও ঐ ক্ষতির স্থূল প্রকাশ হ'তে অনেক সময়ে বহু দেরী হয়। এ ধরনের বিকিরণ শরীরে বেশী ঢুকলে অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই অসুস্থতার প্রকাশ হওয়া সম্ভব, এবং সর্ব-প্রথমে রক্তে এই দুর্ঘটনার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। হাড়ের মজ্জার ( bone marrow-র ) ক্রিয়া ক্ষীণ হয়ে আসে। প্রথমেই, রক্তে শ্বেতকণিকা দ্রুত কমতে থাকে ; পরে লোহিতকণিকার অভাবও প্রকট হয়। এই সময় শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ-ক্ষমতা অত্যন্ত ক'মে যাওয়ায় নানা জটিল রোগের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে চিকিৎসক প্রায়ই অসুস্থতার মূল কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন না, এবং আপাত অসুস্থতারই চিকিৎসা করেন। এ জাতীয় রোগীর ক্ষেত্রে ক্রমাগত নতুন রক্ত সঞ্চালন (blood transfusion) ঘটিয়ে এবং পেনিসিলিন-জাতীয়

ওষুধের প্রয়োগে অনেক সময়ে মজ্জার ক্রিয়া আবার স্বাভাবিক হতেও পারে। এই চিকিৎসা দ্রুত করতে না-পারলে মৃত্যু ঠেকানো যায় না। সবচেয়ে অসুবিধা সেই সব রোগীর ক্ষেত্রে—যাঁরা বিকিরণ গ্রহণ করেছেন কিছুটা অল্প, কিন্তু বিপদ্‌জনক, মাত্রায়। এসব ক্ষেত্রে বাইরে তখন কোনো অসুস্থতার প্রকাশ দেখা যায় না। হয়তো কয়েক বছরের ভিতরেও নয়। কিন্তু, চূড়ান্ত পরিণামে ক্যান্‌সার্‌ বা বংশগত নানা বিকৃতি দেখা দিতে পারে। এমন কি, ঐ বিকিরণে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্যান্‌সার্‌ না-হ'লেও তাঁর পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের বংশধরদের তা' হ'তে পারে। তবে, বিশেষজ্ঞের মতে, বিস্ফোরণের পরে তিন সপ্তাহ কেউ যদি বেঁচে থাকেন, তা'হলে গামা-রশ্মির কারণে তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনা কম,—অন্যান্য ক্ষতি যা'ই হোক। অবশ্য, এই মত বোধহয় অতি সরলীকৃত। হিরোশিমায় মোট দু'লক্ষ মৃত্যুর ভিতরে পঞ্চাশ হাজার মৃত্যুই ছিল বিলম্বিত মৃত্যু,—যা' ঘটেছিল 1946 থেকে 1950, এই পাঁচ বছরের ভিতরে। এর একাংশ গামা-রশ্মিরই প্রসাদপুষ্ট ছিলেন ব'লে আন্দাজ করা যায়।

নাগাসাকি এবং হিরোশিমায় গামা-রশ্মি যাঁদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, তাঁদের অসুস্থতার লক্ষণ ( symptom ) ছিল অত্যন্ত দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট এবং দু'একবার বমি হওয়া। ( নিউট্রন-রশ্মির ক্ষেত্রেও প্রায় একই লক্ষণ প্রকাশ পায়। ) কিন্তু, যাঁরা দু'-চার দিনের মধ্যে মারা যান নি, তাঁরা অল্প দিনের মধ্যেই একেবারে সুস্থ বোধ করেন। কিন্তু, তারপরেই অনেকের ( বিকিরণ গ্রহণের মাত্রা অনুসারে ) জ্বর, আন্ত্রিক রোগ, দুর্বলতা, সমস্ত চুল ঝ'রে পড়া—ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। রক্তে শ্বেতকণিকার অভাব দ্রুত প্রকট হয়, এবং তারপরে লোহিতকণিকার অভাবও দেখা দেয়। অনেকের ক্ষেত্রে ক্ষত একবার দেখা দিলে রক্ত-পড়া আর বন্ধ হ'তে চায় না। এ রকম ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়।

ক্ষয়ক্ষতির আরও নানা দিক আছে—যে সম্পর্কে প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কিছুই বলিনি। এর একটি দিক হ'ল—তীব্র বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি। পরমাণু-বিস্ফোরণের অঞ্চলে বাতাসের পরমাণুতে ইলেকট্রন-সজ্জা সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় পরমাণুর কেন্দ্র এবং ইলেকট্রন একেবারে আলাদা হয়ে যায়, এবং চাপ ও উত্তাপে এই বিচ্ছিন্ন কণিকাগুলো শূন্যপথে দ্রুত ছুটতে থাকে। কোনো তড়িৎবাহী কণিকা শূন্যপথে অসমবেগে ধাবমান হ'লেই তা' থেকে 'বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ' ( electro-magnetic radiation ) হয়। নামের প্রখরতায় ভয় পাবার কিছু নেই ; সাধারণ আলো, বেতার-তরঙ্গ, তাপ-রশ্মি, এক্‌স্‌-রশ্মি, গামা-রশ্মি—সবই ঐ বিকিরণেরই দৃষ্টান্ত,—শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তফাতের জন্যই নামের তফাত। বর্ষার আকাশে বিদ্যুতের সর্পিল চমকও বিদ্যুৎ-

কণার দ্রুত ভ্রমণ ; যা'র ফলে উৎপন্ন বিকিরণ আমাদের বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে এবং সশব্দ বিঘ্ন ঘটায়। পরমাণু-বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে এই ক্রিয়া সহস্রগুণে তীব্র হয়। ক্ষণস্থায়ী অথচ অতি তীব্র বিকিরণ সক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সর্বনাশ করে, এবং এর ক্রিয়া-সীমা হাজার মাইলও হ'তে পারে। বিশেষত— রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, হাসপাতালের যন্ত্রপাতি—এই সবই বিকল হয়। যুক্তরাষ্ট্র যতবার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, ততবারই এটা টের পাওয়া গিয়েছে দূর অঞ্চলেও। এমনকি—সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হ'লেও যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের কিছু অঞ্চলে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি বিকল হবার ঘটনা লক্ষ করা গিয়েছে। তবে, এটা ঠিক—অন্তত এ ব্যাপারে ক্ষয়ক্ষতি যন্ত্রপাতির উপর দিয়েই যায় ; প্রাণীর কোনো বিপদ ঘটায় না।

কিন্তু, বিপদের বিশেষ কারণ ঘটে তেজস্ক্রিয়তায়। প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বলেছিলাম—বিস্ফোরণের সামান্য পরে 'অগ্নিগোলক'-এর ভিতরের চাপ স্বাভাবিক হয়ে যাবার পরে যখন সে মেঘজাল সৃষ্টি ক'রে উপরে উঠতে থাকে, তখন ঐ মেঘ-রাশি অবিশ্বাস্য মাত্রায় তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে। ঐ মেঘ কয়েক মাইল উঠে যাবার পরে পর পর দু'দফায় যখন ছড়াতে থাকে, তখন তেজস্ক্রিয় বস্তুও ঐ সঙ্গে ছড়িয়ে যায়। তেজস্ক্রিয়তাজনিত বিপদ অত্যন্ত বেশী ঘটে যদি খুব অল্প উচ্চতায় বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়, এবং তথাকথিত অগ্নিগোলক যদি মাটি ছুঁতে পারে। সে ক্ষেত্রে মাটিতে একটি গহ্বর সৃষ্টি হয়, এবং মাটির অনেক সূক্ষ্ম কণা অগ্নিগোলকের সঙ্গেই আকাশে ওঠে। প্রচুর তেজস্ক্রিয় বস্তু-কণা মাটির সূক্ষ্ম কণায় গেঁথে যায়, এবং নিছক তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলোর তুলনায় এই তেজস্ক্রিয় মাটির কণা অনেক বেশী ভারী ব'লে আবার দ্রুত নেমে আসে পৃথিবীর উপরে। এ অবস্থায় তেজস্ক্রিয়তাজনিত স্বাস্থ্যহানির এবং মৃত্যুর পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। পরীক্ষায় দেখা যায়—একটি পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ মাটির ঠিক উপরেই ঘটালে নিঃসৃত মোট শক্তির শতকরা দশ থেকে পনেরো ভাগ মাটিই গ্রহণ করে। এর ফলে ভূমিকম্পের মতো ক্রিয়া হয় এবং মাটিতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতো একটি গহ্বর তৈরী হয়। এক মেগাটনের একটি বিস্ফোরণে এই গহ্বরের বিস্তৃতি ( ব্যাস ) হ'তে পারে প্রায় দেড় হাজার ফুট, এবং গভীরতা প্রায় দু'শো ফুট-ও হওয়া সম্ভব,—অবশ্যই ঐ জমির বৈশিষ্ট্য অনুসারে। উৎখনিত বস্তুর অধিকাংশই অবশ্য তৎক্ষণাৎ গহ্বরের চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হয় ; কিন্তু উল্লেখযোগ্য একাংশ ঊর্ধ্বমুখী মেঘপুঞ্জের সঙ্গেই উপরে ওঠে এবং তেজস্ক্রিয় মাটি হিসেবে অচিরেই আবার নেমে এসে অত্যন্ত বিপদ ঘটায়। অবশ্য, হিরোশিমা এবং

নাগাসাকির বিস্ফোরণে এ ধরনের ঘটনার কোনো সম্ভাবনা ছিল না*। এ ধরনের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ কারণে মৃত্যু হয় খুব কম, যদিও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি ( দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি, স্নায়বিক রোগ, বিকলাঙ্গ হওয়া, বংশগত নানা রোগ ইত্যাদি ) যথেষ্টই সম্ভব। তবে আগেও যা' বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের দু'এক ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি নামলে বিপদ অত্যন্ত বেড়ে যায়। অন্যথায় অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ঐ অঞ্চলের তেজস্ক্রিয়তা অনেকটা ক'মে যায়, এবং এক সপ্তাহ পরে বিস্ফোরণের সময়ের তুলনায় তা' অন্তত হাজার ভাগ কম হয়। এর কারণ—বিস্ফোরণে উৎপন্ন অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় বস্তুই অত্যন্ত অল্পায়ু। কিন্তু বিপদ একেবারে কেটে যাওয়া সহজ কথা নয়। কারণ, বিপুল সংখ্যক পরমাণুর বিভাজনের ফলে যে বিপুলতর সংখ্যক তেজস্ক্রিয় পরমাণুর জন্ম হয়েছে—তা'র এক হাজার ভাগের এক ভাগই বা কম কি! উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সংখ্যাটি যদি $10^{25}$ হয়ে হয়ে থাকে, তবে তা'র এক লক্ষ ভাগের এক ভাগও হবে $10^{20}$। যদি পাঁচ হাজার বর্গমাইল জায়গাতেও এটা ছড়িয়ে থাকে বায়ুমণ্ডলের সম্পূর্ণ উচ্চতায়, তা' হলেও বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নগণ্য হবে না। অবশ্য, আমরা আগেও বলেছি—বাতাসের এই তেজস্ক্রিয় বস্তু-কণা কী ভাবে কতটা ক্ষতিকর হবে, তা' বহুলাংশে আবহাওয়া-নির্ভর। প্রবল বাতাসের তাড়নায় ওটা বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক ক'মে যাবে। একবার চীনের মধ্য অঞ্চলে একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পরে তেজস্ক্রিয় বস্তুর অধঃক্ষেপ ধরা পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ায়।

কিন্তু, সাধারণ পরমাণু-বোমা বা হাইড্রোজেন-বোমা—যে কোনোটির বিস্ফোরণে নির্গত নিউট্রনের একাংশ বাতাসের নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত ক'রে তেজস্ক্রিয় কার্বন সৃষ্টি করে। এই কার্বনের অর্ধায়ু প্রায় ছ'হাজার বছর। সুতরাং এটি লক্ষাধিক বছর ধ'রে নিজের অস্তিত্ব মোটামুটি বজায় রাখতে পারে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিনাস পলিং হিসেব ক'রে বলেছেন—প্রতি দশ মেগাটন বিস্ফোরণে জাত তেজস্ক্রিয় কার্বনের প্রভাবে 15000 শিশু বিকৃত দেহ বা বুদ্ধি নিয়ে জন্মাবে।

প্রথম পরমাণু-বিস্ফোরণ 'ট্রিনিটি'র ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার বিষয়টি অত্যন্ত কৌতূহল এবং যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেবার সুযোগ এখানে নেই। সংক্ষেপে দু'একটি ঘটনার কথাই বলা যেতে পারে। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে [ তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ]—এই বিস্ফোরণ

* হিরোশিমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল মাটি থেকে 1670 ফুট উপরে এবং নাগাসাকির বিস্ফোরণ 1640 ফুট উপরে।

ঘটানো হয়েছিল মাটি থেকে মাত্র একশো ফুট উঁচুতে—একটি ইস্পাতের ফ্রেমের উপরে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও জমির উপরে একটি গহ্বরের সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল, যদিও কার্যত তেমন বৃহৎ গহ্বর কিছু দেখা দেয় নি। কিন্তু, বিস্ফোরণের 'অগ্নিগোলক' এ ক্ষেত্রে জমি স্পর্শ করেছিল এবং বালুকাময় ঐ জমিকে ঈষৎ সবুজ কাচে পরিণত করেছিল—যা' অবশ্যই হয়েছিল অত্যন্ত তেজস্ক্রিয়। উত্থিত মেঘপুঞ্জের সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রচুর বালুকণা বা ধূলিকণা এ ক্ষেত্রেও আকাশে উঠেছিল, এবং তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা হিসেবেই তা' ঐ অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নেমে আসে। পরীক্ষাস্থলের পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূরের একটি গো-চারণভূমিতে ঐ তেজস্ক্রিয় ধূলি যথেষ্ট পড়েছিল। গোরুদের পিঠে ঐ ধুলো পড়ায় এবং লোমের ফাঁকে সে ধুলো বেশ কিছুদিন আটকে থাকায় অনেক গরুর পিঠ লোমশূন্য হয়ে যায় এবং অনেক গোরুর পিঠে ক্ষত দেখা দেয়, যদিও মারাত্মক পরিণতি কিছু হয়নি। ঘটনাস্থলের হাজার মাইল দূরে একটি শস্যক্ষেত্রে প্রচুর বৃষ্টির সঙ্গে তেজস্ক্রিয় ধূলি-কণা নেমেছিল। এর পরিণতি হয়েছিল অদ্ভুত। এর কিছু শস্যের খড়জাতীয় অংশ থেকে প্যাকিং-এর মোটা কাগজ তৈরী হয়েছিল। সেই কাগজ কিনেছিল একটি কোম্পানী—তাদের তৈরী ফটো-প্লেট্ মুড়ে রাখার জন্য। কিছুদিন বাদেই দেখা গেল—কাগজের মৃদু তেজস্ক্রিয় বিকিরণে ফটো-প্লেটের কুমারীত্ব নষ্ট হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ঐ কোম্পানী তখনকার মতো ঐ অঞ্চলের শস্যে তৈরী কাগজের ব্যবহার বন্ধ রাখে।

পরমাণু-বিস্ফোরণের সব রকম ক্ষয়ক্ষতির আলোচনা এখানে আমরা করিনি ; এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। এই ধরনের বিস্ফোরণের এমন অনেক প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে, যা'র ফলে সম্পূর্ণ প্রাণী-জগৎই বিপন্ন হবে। একটি সম্ভবপর ক্রিয়া—ওজোন-স্তরের ক্ষয়। পৃথিবীর মাটি থেকে দশ এবং কুড়ি মাইল উচ্চতার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ওজোন-গ্যাসের একট অগভীর স্তর আছে। ওজোন (ozone) আসলে অক্সিজেনের একটি বিশেষ আণবিক রূপ। ঊর্ধ্বলোকের এই স্তরটি পৃথিবীর প্রাণী-জগৎ রক্ষায় একটি অসাধারণ কাজ করে : সূর্যের অধিকাংশ অতিবেগনী রশ্মি (ultraviolet ray) শুষে নিয়ে ঐ তীব্র, ক্ষতিকর রশ্মির হাত থেকে আমাদের বাঁচায়,—বিশেষত, আমাদের চোখকে। পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণে বাতাসে অতি প্রচুর পরিমাণে, 'নাইট্রোজেন অক্সাইড' অণু তৈরী হয়—যা' ওজোন-অণুকে ধ্বংস করে। আমেরিকার 'দি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব্ সায়েন্সেস্' হিসেব ক'রে বলেছেন—মোট দশ হাজার মেগাটনের বিস্ফোরণে উত্তর গোলার্ধে ওজোন-স্তরের আশি ভাগ এবং দক্ষিণ গোলার্ধে তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগ নষ্ট হ'তে পারে। অধিকাংশ প্রাণীর

অন্ধ হবার পক্ষে ওজোন-স্তরের শতকরা কুড়ি ভাগ ক্ষীণ হওয়াই যথেষ্ট। মানুষ ইতিমধ্যেই বাতাসে সম্ভবত কয়েকশো মেগাটনের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। প্রাণী-জগৎ ইতিমধ্যেই কীভাবে কতোটা বিপন্ন হয়েছে—তা'র সঠিক খবর আমরা জানি না।

বস্তুত, হিরোশিমা এবং নাগাসাকির ঘটনাতেই পরমাণু-বিস্ফোরণের ফলাফল পরীক্ষার যথার্থ সুযোগ হয়েছিল। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত পরমাণু-বিস্ফোরণের অজস্র পরীক্ষা হ'লেও তা'র ফলাফল লক্ষ করেছে ঐ পরীক্ষাকারী দেশ, এবং নিশ্চয়ই বিস্তৃতভাবে ঐ ফল প্রকাশিত হয়নি। জাপানে বোমা নিক্ষেপের পরে 1946 এবং 1948 সালে যুক্তরাষ্ট্র পরপর অনেকগুলো বিস্ফোরণ ঘটায় প্রশান্ত মহাসাগরের জনহীন কয়েকটি অঞ্চলে এবং জলগর্ভে। 1946 সালের জুন মাসে বিকিনি উপহ্রদের (Bikini lagoon-এর) উপরে তা'রা যে বিস্ফোরণ ঘটায় তার ফল পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের মোট তিয়াত্তরটি জনহীন জাহাজ নীচে সাগরজলের উপরে রাখা হয়। বিস্ফোরণটি ঘটানো হয় জল থেকে 520 ফুট উপরে। এর ফলে দু'টি জাহাজ ('Gilliam' এবং 'Carlisle') ডুবে যায়, এবং আঠেরোটি নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরের মাসে ঐ অঞ্চলেই জলগর্ভে (নব্বই ফুট গভীরে) একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়—যা'র ফলে একটি রণতরী ('Arkansas') সমেত দশটি জনহীন জাহাজ ডুবে যায়। 1948 সালে এনিওয়েটক্ প্রবালশিরায় (Eniwetok atoll-এ) বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং 'আমেরিকান্ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন্' ওখানে একটি স্থায়ী বিস্ফোরণ-স্থল তৈরি ক'রে রাখে। এই সমস্ত বিস্ফোরণের বিস্তৃত ফল প্রকাশিত হয় নি। তবে, বিকিনির প্রথম বিস্ফোরণে ধারণাতীত কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু, জলগর্ভে বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়; সেই সঙ্গে ঘাত-তরঙ্গের এবং গ্যাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় কোটি কোটি টন সফেন জলের একটি অর্ধগোলক শূন্যে জেগে ওঠে। এই উত্থান এবং আলোড়নকারী বিপুল পতন সুন্দরভাবে আলোকচিত্রে ধ'রে রাখা হয়। এই জলস্তম্ভের শীর্ষ প্রায় এক মাইল উঁচুতে উঠেছিল; জলের ভিতরে যে ঘাত-তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা'র প্রচণ্ডতা হয় বাতাসের তুলনায় অনেক বেশী। জলগর্ভে বিস্ফোরণে, যতদূর জানা যায়, গামা-রশ্মি এবং নিউট্রনের বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না, এবং উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বস্তুর অধিকাংশই উত্থিত জলস্তম্ভের সঙ্গেই থাকে। বিকিনির ঐ দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেও জলের ফোয়ারার সঙ্গেই অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঐ উপহ্রদেই ফিরে এসেছিল—যদিও কিছু অংশ বাষ্পের সঙ্গে উপরেই চ'লে যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শরীরের

উপরে বিপুল জলস্তম্ভের পতনের উচ্ছ্বাস সহ্য ক'রেও যে জাহাজগুলো দাঁড়িয়েছিল, তা'রা তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়, এবং ঘটনার কয়েক মাস পরেও ঐ সব জাহাজের ডেক্-এ দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ ছিল না। ঐ জাহাজগুলোকে দড়ি লাগিয়ে টেনে নেওয়া হয় উপহ্রদের বাইরে, এবং গভীর সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এনিওয়েটকের পরীক্ষা সম্পর্কে একেবারেই কিছু জানা যায় না। কেবল বলা হয়েছিল—এগুলো উন্নত জাতের বোমার পরীক্ষা।—এখানে 'উন্নত জাত' বলতে অবশ্যই হাইড্রোজেন-বোমার কথা বলা হয়নি। সাধারণ পরমাণু-বোমার কোনো উন্নততর গঠন-কৌশলকে বোঝানো হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর মাটির অনেক গভীরে এবং মাটি থেকে অনেক উঁচুতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে পাঠকের হয়তো আগ্রহ থাকতে পারে। মাটির গভীরে বিস্ফোরণের প্রথম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ 1957 সালে 1·7 কিলোটনের একটি বিস্ফোরণ [ সংকেত : RAINIER ], যা' ঘটানো হয় 790 ফুট নীচে। বোমাটি রাখা হয়েছিল 6×6×7 ফুট পরিসরে। বিস্ফোরণের পরে পরিসরটি 62 ফুট ব্যাসার্ধের একটি গোলক হয়ে দাঁড়ায়, যা'র সীমান্ত চিহ্নিত হয়েছিল চার ইঞ্চি পুরু গলিত পাথরে। সব দিকে 130 ফুট দূরত্ব অবধি পাথুরে জমি গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। কয়েকশো মাইল দূরেও ভূকম্পন ছিল স্পষ্ট। আরও শক্তিশালী বিস্ফোরণ 'BENHAM' ঘটানো হয় 1968-র ডিসেম্বরে মাটির 4600 ফুট নীচে। বিস্ফোরণটি ছিল 1·1 মেগাটনের। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ছিল—মাটির অনেক গভীরে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটালে স্বাভাবিক ভূমিকম্পও জেগে উঠবে। কিন্তু, বহু পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে—ঐ আশঙ্কা অমূলক। নেভাডা অঞ্চলে উল্লিখিত 'BENHAM'-বিস্ফোরণটি ঘটাবার কিছুকাল আগে 104 ঘণ্টা ধ'রে ঐ অঞ্চলের ভূমিকম্প পরীক্ষা করা হয়, এবং মোট 620-টি কম্পন ধরা পড়ে। BENHAM সমেত 235-টি বিস্ফোরণের পরে 104 ঘণ্টায় ধরা পড়ে প্রায় সমান সংখ্যক ( 616-টি ) ভূমিকম্প। এর পরে পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্পবহুল অঞ্চলের অ্যাম্‌চিট্‌কা-দ্বীপে 1969-এর অক্টোবরে 4000 ফুট গভীরে 1 মেগাটনের একটি বিস্ফোরণ ( 'MILROW' ) এবং 1971-এর নভেম্বরে 5875 ফুট নীচে প্রায় 5 মেগাটনের একটি বিস্ফোরণ ('CANNIKIN') ঘটিয়েও একই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

পৃথিবীর মাটি থেকে বহু উঁচুতে প্রচুর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে 1963 সাল পর্যন্ত। এইসব পরীক্ষার সামরিক গুরুত্ব এখনও তেমন স্পষ্ট নয় ; কিন্তু, তাত্ত্বিক গবেষণায় এরা আকর্ষণীয় ফল দেখিয়েছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের মতো এ ক্ষেত্রেও আমরা কয়েকটি মার্কিন পরীক্ষার কথাই বলতে পারি, যেহেতু অন্য দেশের পরীক্ষা সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। মহাকাশে আমেরিকা

অনেকগুলো বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল জনস্টন-দ্বীপের নিকটবর্তী একটি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে। 1958 সালের 1লা এবং 12ই আগস্ট যথাক্রমে 48 ও 27 মাইল উঁচুতে দু'টি বিস্ফোরণ ( 'TEAK' এবং 'ORANGE' ) ঘটানো হয়। দু'টির শক্তিই মেগাটন-মাত্রার। অল্প উচ্চতায় এবং অনেক উঁচুতে বিস্ফোরণের প্রধান তফাত এই যে, যেহেতু বেশী উচ্চতায় বাতাসের ঘনত্ব খুব কম, তাই তাপরশ্মি সেখানে আরও দ্রুত এবং বিশালাকার অগ্নিগোলক সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বাতাসের যে পরিমাণ অণু ঐ বিস্ফোরণের নিঃসৃত উত্তাপ প্রাথমিকভাবে গ্রহণ ক'রে দ্যুতিমান হয়ে ওঠে, তা' অল্প এলাকাতে থাকা সম্ভব নয়। একই কারণে—উচ্চলোকে ঘাত-তরঙ্গর ভূমিকা গৌণ। বিস্তৃততর আলোচনা পরমাণু-বিজ্ঞানের জটিল স্তরে বিরাজ করে। জটিল ক্রিয়ার ফলে কৃত্রিম অরোরা দেখা দিতে পারে। উল্লিখিত দু'টি বিস্ফোরণের পরেই অরোরার দ্যুতি দেখা যায় জনস্টন-দ্বীপ থেকে দু' হাজার মাইল দূরেও, এবং তা' বহু মিনিট স্থায়ী হয়। এই দ্বীপ থেকে এর পরে 1962 সালের জুলাই থেকে নভেম্বরের ভিতরে ঊর্ধ্বলোকে যে চারটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তা'দের ভিতরে 9ই জুলাই-এর বিস্ফোরণ [ 'STARFISH PRIME,' 1·4 মেগাটন ] উল্লেখযোগ্য। এটি ঘটানো হয় মাটি থেকে 248 মাইল উপরে। এর আগে দক্ষিণ আটলাণ্টিক সমুদ্রের উপরে 1958 সালে 125—300 মাইল উচ্চতার ভিতরে তিনটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয় [ 'ARGUS Operation' নামে পরিচিত ]। প্রত্যেকটি 1 বা 2 কিলোটন শক্তির। মার্কিন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য অনুসারে, শেষোক্ত তিনটি বিস্ফোরণ ঘটানোর একমাত্র উদ্দেশ্য নিষ্কাম জ্ঞানচর্চা ; সামরিক মতলব এক্ষেত্রে আদৌ ছিল না। এইসব অতি উচ্চলোকের বিস্ফোরণে ক্ষতিকর বিভিন্ন কণিকা এবং রশ্মি কীভাবে পৃথিবীর উপরে ছড়িয়ে যায়' তা' লক্ষ করাই ছিল প্রত্যেক পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। দেখা যায়, এই জাতীয় বিস্ফোরণে পৃথিবীবাসীর পক্ষে বিভিন্ন ক্ষতিকর রশ্মির প্রত্যক্ষ প্রভাব উল্লেখযোগ্য নয় ; এবং পৃথিবীর উপরে কণিকার বর্ষণ নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীর চুম্বকত্বর প্রভাবে। অতএব, ক্ষতিকর কণিকাগুলো পৃথিবীর বাতাসে এবং মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে জটিল নিয়মের নিয়ন্ত্রণে।

জলের অনেক গভীরে বিস্ফোরণের ফলাফল অত্যন্ত সতর্কভাবে গোপন রাখা হয়েছে। সমরবিদ্‌রা মনে করেন—এই জাতীয় বিস্ফোরণের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। 1946 সালে বিকিনি-উপহ্রদের অল্প গভীরতায় যে বিস্ফোরণটির কথা আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি [ সাংকেতিক নাম 'BAKER' : 20 কিলোটন ], কেবল তা'র ফলাফলই কতকটা বিস্তৃত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এর পরে 1955 সালের মে-মাসে আমেরিকা জলের 2000 ফুট গভীরে এবং 1958 সালের

মে-মাসে 500 ফুট গভীরে দু'টি পরমাণু-বিস্ফোরণ [ যথাক্রমে 'WIGWAM' এবং 'WAHOO' ] ঘটায়—যা'দের বিষয়ে একটিও তথ্য প্রকাশ পায়নি। এর পরে আমেরিকা জলগর্ভে আরও দু'টি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে চূড়ান্ত গোপনীয়তার আড়ালে। জলের মধ্যে ঘাত-তরঙ্গের ক্রিয়া হয় অনেক দূরপ্রসারী এবং বিধ্বংসী, যদিও তুলনামূলকভাবে ক্ষণস্থায়ী। জলের গভীরে একটি 100 কিলোটনের পরমাণু-বিস্ফোরণে 3000 ফুট দূরত্বেও বাড়তি চাপ দাঁড়ায় বর্গইঞ্চিতে 2700 পাউন্ড, বাতাসের ক্ষেত্রে যা' হবে কয়েক পাউন্ড মাত্র। গুরুত্বর সামরিক তাৎপর্যের এটাই বোধহয় মূল কারণ।

হাইড্রোজেন-বোমার ক্রিয়া সম্পর্কে আলাদা ভাবে বিশেষ কিছু বলা শক্ত। যেহেতু এই বোমা কোনো শত্রু-দেশের জনপদের উপরে নিক্ষিপ্ত হয়নি, তাই এর ফলাফল গোপন রাখা সম্ভব হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি—আধুনিক সমর-কৌশলে অতি শক্তিশালী (অর্থাৎ—ওজনে ভারী) পরমাণু-বোমা বা হাইড্রোজেন-বোমার তুলনায় কম শক্তিশালী (কিলোটন মাত্রার) এবং হাল্কা বোমার কদর বেশী। অত্যন্ত ভারী বোমাকে ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী লক্ষ্যে সঠিক পেঁছে দেওয়া যায় না। তা'ছাড়া, সমরবিদ্‌রা বলেন, একটি মেগাটন-বোমার তুলনায় একশো কিলোটন শক্তির দু'টি বোমার সাহায্যে অনেক বেশী ক্ষতি করা যায়। উচ্চশক্তির বোমাতে বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলের প্রায় সব কিছুই বাষ্পে পরিণত হয়,—যা' শক্তির অপব্যয় মাত্র। অতএব, ভবিষ্যতের মহাযুদ্ধে যদি পরমাণু-শক্তির ব্যবহার হয়, তবে তা'র নীতি হবে—অল্প শক্তিশালী বোমা বহু সংখ্যায় ব্যবহার করা। তা'ছাড়া, আধুনিক সমর-বিজ্ঞান সাধারণ পরমাণু-বোমার তাপ-রশ্মি এবং ঘাত-তরঙ্গকে ফাঁকি দেবার উপযুক্ত আশ্রয় তৈরি করতে পারে,—যা'র ভিতরে থেকে সামরিক বাহিনীর লোকেরা যুদ্ধ চালাতে পারে। মূলত এরই পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রয়েছে নিউট্রন-বোমা—যা' অত্যন্ত সুরক্ষিত আশ্রয়েও মানুষের ক্ষতি করতে পারে, যদিও—ঘর-বাড়ী ধূলিসাৎ করা বা তাপ-রশ্মি ছড়ানোর কাজে ততটা পটু নয়। কিন্তু, বাস্তব সত্য এই যে, আধুনিক পরমাণু-বোমার ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা খুব সামান্যই জানি বা আন্দাজ করতে পারি। এ বিষয়ে কার্যত কোনো আলোচনাই প্রকাশিত হয়নি। অনেক পরমাণু-বিশেষজ্ঞের মতে—অতি উন্নত কয়েকটি ধরনের বোমা বৃহৎ শক্তিদের হাতে রয়েছে—যাদের কোনো পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণও ঘটানো হয়নি গোপনীয়তা রক্ষার কারণে।*

* পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণের ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা নানা বইতে এবং পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। মাত্র একটি বইতে উল্লেখযোগ্য এবং মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য পাঠক Samuel Glasstone এবং Philip J. Dolan-এর বিপুলায়তন বই 'The Effects of Nuclear Weapons' (U. S. Govt., 1977) দেখতে পারেন।

## পাঁচ / বিশ্ব-পরিস্থিতি

পরমাণু-বোমার উদ্ভাবন, বিশেষত—প্রয়োগ, মানুষের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ-রীতি, নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি অনেক কিছুর ব্যাকরণ প্রায় রাতারাতি বদলে যায়। পরমাণু-বোমার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আজ সুদীর্ঘ আলোচনার বিষয়। এই পুস্তিকায় ঐ আলোচনার স্থান হওয়া সম্ভব নয়। পরমাণু-বোমার অস্তিত্বের জন্য বিশ্ব-পরিস্থিতি এবং বহু দেশের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে ছ'টি দেশ ঘোষিতভাবেই পরমাণু-বিস্ফোরণের পরীক্ষা করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এই পরীক্ষার কথা গোপন করেছে ব'লে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। অতি সম্প্রতি পাকিস্তানের নামও এই শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। কিছু দেশের ভাণ্ডারে এই অস্ত্র মজুত আছে, যদিও তা'রা কোনো পরীক্ষা করেনি —এমন সন্দেহও করা হয়। উন্নত বহু দেশ এই অস্ত্র তৈরি করেনি, যদিও তা'রা যে কোনো সময়ে এটা পারে। পরমাণু-চুল্লী (atomic reactor) এখন অনেক অনুন্নত দেশেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ইউরেনিয়াম যদি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে প্লুটোনিয়াম আপনা থেকেই তৈরী হবে। উপযুক্ত কারখানার ('reprocessing plant'-এর) সাহায্যে এই প্লুটোনিয়াম আলাদা ক'রে পরমাণু-বোমাতে ব্যবহার করা যেতেই পারে। বাড়তি সমস্যা শুধু বোমাটিকে সঠিক গঠন করা। এ কাজের উপযুক্ত কিছু বিজ্ঞানী এখন প্রায় সব অর্ধোন্নত দেশেই পাওয়া যায়। নতুন পরমাণু-চুল্লীর প্রতিষ্ঠা বন্ধ করা কার্যত অসম্ভব। বিদ্যুৎশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বহু দেশ এখন পরমাণু-শক্তির দিকেই ঝুঁকেছে। এ কাজের সাফল্যের জন্য উন্নত কোনো দেশের সহযোগিতা প্রায়ই প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু, শর্তসাপেক্ষে সীমিত সহযোগিতা পাওয়া কঠিন হয় না। কারণ, এখানেও বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রশ্ন আছে। শান্তিরক্ষার শর্ত আরোপ ক'রেও উন্নতিশীল এবং আগ্রহী কোনো দেশকে দীর্ঘকাল আটকে রাখা যায় না। সেই দেশ নিজের বিজ্ঞান-প্রতিভা এবং অর্থবল কাজে লাগিয়ে নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে। পরমাণু-চুল্লী গঠনের মৌলিক নীতি-নির্ধারণ আজকাল পাঠ্য-বইতেও সুলভ।* একেবারে সঠিক মাপজোখ (design)

* 1965 সালে ভারত-সরকারের ঘোষণা: "The process used in Trombay's Plutonium Plant is based on published technical literature." এবং "...designed, engineered and built entirely by Indian scientists and engineers without any foreign collaboration."

গুপ্তচরবৃত্তির সাহায্যে বা অন্য কোন নিপুণ কৌশলে বিদেশ থেকে চোরা-পথে সংগ্রহ করাও সম্ভব হ'তে পারে।*

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না—প্রথম পরমাণু-বোমা তৈরীর সময়ে যুক্তরাষ্ট্র যে বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছিল (যা'র কিছুটা আভাস আমরা পেয়েছি তৃতীয় পরিচ্ছেদের আলোচনায়), তা'র এক শতাংশ আয়োজনেরও আজ আর দরকার নেই। সে যুগে পরমাণু-বোমা তৈরি করতে গিয়ে পরমাণু সম্পর্কেই মানুষের সামগ্রিক জ্ঞান অনেক বাড়াতে হয়েছিল; ব্যর্থ অনেক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সাফল্য খুঁজতে হয়েছিল; সমস্যার প্রকৃতি-সন্ধান এবং সাফল্যের পথ-নির্দেশ বিরাট লোকবল ও অর্থবল দাবি করেছিল। বিজ্ঞানীরা অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে অসহায়ভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন—যা' বোঝাতে গিয়ে এক বিজ্ঞানী 'swimming in syrup'-এর উপমা দিয়েছেন। সেই তুলনায় এখনকার কাজ অনেক সহজ এবং সংক্ষিপ্ত।** এর ফলে ক্রমশই বহুতর দেশ এই মারণাস্ত্রের অধিকারী হয়ে ওঠায় সমস্যা কী ভাবে বাড়ছে বা জটিলতর হচ্ছে, সে প্রশ্ন বাদ দিয়েও আর এক সাংঘাতিক সমস্যার কথা বলা যায়: সন্ত্রাসবাদী কোনো দলের হাতে এই অস্ত্র থাকার ফল কী হ'তে পারে!—এখনও এই আশঙ্কা নিশ্চিত বাস্তব রূপ না-নিলেও এটা যে খুবই বাস্তব সম্ভাবনা—তা'তে বিশেষ ভুল নেই। এখন পর্যন্ত যে সব ঘটনা আমাদের জানা আছে, তা' থেকে বড় জোর বলা যায়—কোনো সন্ত্রাসবাদী দল পরমাণু-বোমা তৈরীর কারখানা হয়তো এখনও গ'ড়ে তুলতে পারেনি। এখন পর্যন্ত তা'রা আগ্রহ দেখিয়েছে কেবল তস্করবৃত্তির সাহায্যে ওই অস্ত্র অধিকার করবার। একেবারে তৈরী পরমাণু-বোমার নাগাল তা'রা যদিও পায়নি, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিভিন্ন দেশের সরকারের

* পাকিস্তানের একটি 'enrichment plant' (যা'তে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে $U^{235}$ আলাদা করা হয়) সম্পর্কে এই অভিযোগ আছে: "...Plans for the plant was stolen by a Pakisthani scientist, Dr. Abdul Quadeer Khan, from European enrichment and research center URENCO, at Almelo, in the Netherlands."

[The First Nuclear World War—O' Heffernan et al (N. Y. 1983)]

** "Aspiring nuclear scientists from all over the world can now find most of the information they need to build a bomb in their own public library. This fact, together with the great reduction in cost of equipment and raw materials, has taken away most of the difficulty of A-bomb construction."

('Science News Letter,' October 31; 1964).

কঠোর প্রহরা ভেদ ক'রেও বারবার চুরি হয়েছে, এখনও যা' বন্ধ করা যায়নি। এখন পর্যন্ত পরমাণু-বোমা ব্যবহারের হুমকি দিয়ে কেবল অর্থোপার্জনের ঘটনাই প্রকাশিত হয়েছে; রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টার ঘটনা প্রকাশ পায়নি। একটি ঘটনায়—স্যান্ ফ্রান্সিস্কোর মেয়র্কে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল যে, ঐ শহরে পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হবে যদি দশ কোটি ডলার অবিলম্বে দেওয়া না হয়। FBI-এর বিবেচনায় এই চিঠি গুরুত্বহীন ব'লে গণ্য হয়। কিন্তু, ক্যালিফোর্নিয়ার 'য়ুনিয়ন অয়েল কোম্পানী'র একটি শোধনাগার কুড়ি কিলোটনের পরমাণু-বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়ে যখন দশ লক্ষ ডলার চাওয়া হয়েছিল, তখন FBI ঘটনাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়, এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে হুমকিদাতার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। NEST (Nuclear Engineering and Search Teams)-সদস্যরা ঐ কোম্পানীর এলাকায় লুকোনো পরমাণু-বোমার খোঁজে ব্যাপক তল্লাশ চালায়। —এই জাতীয় অজস্র ঘটনার উল্লেখ করা সম্ভব।* এই ধরনের হুম্কির গুরুত্ব বিবেচনা করতে হয় হুম্কিদাতাদের হাতে সত্যিই ঐ অস্ত্র থাকা সম্ভব কি না, সেই বিবেচনার ভিত্তিতে। কিন্তু, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী আগার থেকে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম এবং অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান চুরি যায়, তা'তে সন্ত্রাস-বাদীদের হাতে পরমাণু-বোমা থাকার বিষয়টি অগ্রাহ্য করা যায় না। একটি হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে—1974 সাল পর্যন্ত আমেরিকাতে প্লুটোনিয়াম এবং আংশিক বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম চুরি গিয়েছে মোট আট হাজার পাউন্ড। এ ছাড়াও, পরমাণু-বোমা গঠনে বিশেষ দরকার হয়—এমন জিনিস ধারণাতীত পরিমাণে চুরি হয়ে থাকে—যা' আবার কালোবাজারে কিনতে পাওয়া যায়, এবং অনেক দেশের সরকার তা' কিনতে আগ্রহী হয় শর্তের বাঁধন এড়াবার জন্য। 1974 সালে আমেরিকার 'অ্যাটমিক্ এনার্জি কমিশন'-এর একটি রিপোর্টে বলা হয় যে—পরমাণু-শক্তি সংক্রান্ত জিনিসপত্র রাখার এবং স্থানান্তরের জন্য যে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা আছে তা' যথেষ্ট নয়। যাইহোক, কোনো গুপ্তসংস্থা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বা হাত-বদলের লড়াইতে পরমাণু-বোমা ব্যবহার করতে চাইবে, তখন বিশ্ব-পরিস্থিতি আবার নতুন ক'রে বদলে যাবে।

নিরস্ত্রীকরণই পরমাণু-শক্তির আতঙ্ক থেকে বাঁচবার সম্ভবত একমাত্র পথ।

---

* সন্ত্রাসবাদী ঘটনার সমস্ত তথ্য O' Heffernan ইত্যাদির উল্লিখিত বই থেকে গৃহীত। এই বই-এর নবম পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে প্রচুর ঘটনা এবং তথ্যের উল্লেখ আছে—আগ্রহী পাঠক যা' প'ড়ে দেখতে পারেন।

কিন্তু, এই পথ সরল ও সুনির্দিষ্ট নয়। এর বাস্তব রূপায়ণের সমস্যার কথা বাদ দিলেও, নিছক তাত্ত্বিক অবয়বটিও সুস্পষ্ট এবং সকলের দৃষ্টিতে এক রকম হয় না। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের জন্য এবং শান্তির জন্য দু'রকমের পরমাণু-শক্তির অস্তিত্ব নেই। সমস্ত পরমাণু-চুল্লী এবং ইউরেনিয়াম-235 পৃথকীকরণের কেন্দ্র (বা enrichment plant) যদি একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, এবং প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়ামের ($U^{235}$-এর) সমস্ত সঞ্চয় যদি নিঃশেষ ক'রে দেওয়া হয়, তবেই হয়তো পরমাণু-শক্তির আতঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু, সহজেই আমরা বুঝতে পারি—বাস্তবে তা' হবার নয়। পরমাণু-শক্তির তথাকথিত 'শান্তিপূর্ণ' ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবার অজুহাতে বৃহৎ শক্তিগুলো এ ধরনের চরম ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী হবে না। এর গভীরতর কারণ—অবিশ্বাস। এক দেশের ভাণ্ডারে কী রয়ে গিয়েছে, তা'র সুনিশ্চিত হিসেব অন্য দেশ পাবে না, এবং এক দেশের পরমাণু-অস্ত্রশালা উজার ক'রে দেবার স্বীকারোক্তি অন্য দেশগুলো বিশ্বাস করতে দ্বিধা করবে।

পিছনের দিকে তাকিয়ে যখন আমরা পরমাণু-বোমার উদ্ভাবনের এবং প্রসারের কারণগুলো বিশ্লেষণ করতে বসি, তখন যে সব সিদ্ধান্তে পেঁছোই—তা'র পরিপ্রেক্ষিতে নিরস্ত্রীকরণের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব ব'লে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। পরমাণু-বোমার উদ্ভাবন হয়েছিল কেন? সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীকে বাধা দেবার জন্য?—এটাই যদি কারণ হবে, তবে প্রেসিডেণ্ট্ ট্রুম্যান্ কেন মিত্রশক্তিদের—বিশেষত, সোভিয়েত রাশিয়াকে—1945-এর আগেই 'ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্ট্'-এর কথা খুলে বললেন না? জার্মানীর পতনের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখেও পরমাণু-বোমা তৈরীর কাজ কেন দ্রুততর করা হয়েছিল? পরমাণু-বোমার একটি পরীক্ষামূলক, প্রকাশ্য বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জাপানকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হয়নি কেন?—এর পিছনে ছিল আমেরিকার শক্তিমত্তা প্রচারের উগ্র আকাঙ্ক্ষা, যা' অন্যান্য শক্তিশালী দেশকেও স্বভাবতই একই আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু, এটাও কি মূলতম কারণ? 1938-39 সালে পরমাণু-বিজ্ঞান গবেষণা যে দশায় পেঁছেছিল, শুধু কি তা'ই শেষ পর্যন্ত ঐ অস্ত্র উদ্ভাবনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঐ কাজ দ্রুততর করা ছাড়া আর কি কিছু করেছিল? জার্মানীর পরাজয়ের পরেও ম্যান্হাটান্ প্রোজেক্টের বিশিষ্ট অধিকাংশ বিজ্ঞানী ঐ অস্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে কোনো কথা বলতে চান নি, বাধা দেওয়া দূরে থাকুক। বরং বলেছেন—ওটা বিজ্ঞানীদের ভাববার বিষয় নয়। ওপেনহাইমার্, ফের্মি, টেলার্ ইত্যাদি অজস্র স্বনামধন্য বিজ্ঞানী মনে করেছেন—বিজ্ঞানীর অধিকার আছে যে কোনো মূল্যে বিজ্ঞানগত কৌতূহল মেটাবার। সুতরাং, মনে হয়—অধিকাংশ

বিজ্ঞানী ম্যান্‌হাটান্‌ প্রোজেক্টে অংশ নিয়েছিলেন নিছক বিজ্ঞানগত কৌতূহলে ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এঁদের সেই কৌতূহল মেটাবার অসাধারণ সুযোগ ক'রে দিয়েছিল। জাপানে ঐ অস্ত্র প্রয়োগের পরে অবশ্য কিছু বিজ্ঞানীর মনোভাব বদলেছিল।

অন্তত ছ'টি দেশে পরমাণু-বোমা প্রসারের সম্পূর্ণ ইতিহাস বা পটভূমি এখানে স্মরণ করা সম্ভব নয়। তবে সব দেশেরই সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল—শক্তিমান দেশের স্বীকৃতি বা সম্মান লাভ, যদিও আপাত কারণ হয়তো সব ক্ষেত্রেই কিছুটা আলাদা। আমেরিকা পরমাণু-বোমার অধিকারী হবার পরে দ্বিতীয় বৃহৎ-শক্তি রাশিয়া নিশ্চেষ্ট থাকতেই পারে না ; এমন কি—আমেরিকার নিরস্ত্রীকরণ-প্রস্তাবে বিশ্বাস রাখাও তা'র পক্ষে তখন শক্ত। এ কথা মনে করার কারণ আছে—জাপানে পরমাণু-বোমা প্রয়োগের আগে পর্যন্ত এই অস্ত্রের সামরিক প্রয়োগ সম্পর্কে সে সচেতন ছিল না। ঐ অস্ত্র তৈরীর চেষ্টাও সে আগে করেনি। ফলে, 1949-এ রাশিয়ার পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণের সংবাদে আমেরিকা বিস্মিত হয়। ( সংবাদটি আমেরিকাই আগে প্রচার করে। ) রাশিয়ার এত দ্রুত অগ্রগতি সে আশা করেনি। এই সময়েই আমেরিকার একটি রাজনৈতিক মহলে রাশিয়ার গুপ্তচরবৃত্তির কথা ওঠে, এবং কমিউনিজ্‌ম্‌কে আতঙ্কের উৎস হিসেবে চিহ্নিত ক'রে আমেরিকার সমরসজ্জা আরও বাড়াবার জন্য চাপ দেওয়া হয়। সিনেটর্‌ ম্যাক্‌কার্থি ছিলেন এর অন্যতম পুরোধা। আমেরিকা হাইড্রোজেন-বোমা তৈরীর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধী মতের নেতৃত্ব দেওয়ায় ওপেন্‌হাইমার্‌ নানাভাবে অসম্মানিত এবং 'অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন্‌'-এর উচ্চপদ থেকে অপসারিত হন। এডোয়ার্ড্‌ টেলারের নেতৃত্বে নতুন কার্যক্রম হাতে নিয়ে আমেরিকা 1952-র শেষ দিকে হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় ; কিন্তু, 1953-র মাঝামাঝি রাশিয়াও সাইবেরিয়ায় একই ধরনের পরীক্ষা করে।

ব্রিটেন ম্যান্‌হাটান্‌ প্রোজেক্টে আমেরিকার অংশীদার থাকলেও গোপনীয়তার নানা বিধি-নিষেধের জন্য কার্যক্রমের সম্পূর্ণ রূপটি তা'র গোচরে ছিল না। যুদ্ধের শেষে ব্রিটেন প্রয়োজনীয় সমস্ত কারিগরী তথ্য দাবি করলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট্‌ শুধু তা' প্রত্যাখ্যান করলেন না, 1946-এর আগস্টে একটি আইন তৈরি ক'রে পরমাণু-বোমার কোনো উপাদান এবং কারিগরী তথ্য অন্য দেশে পাঠানো নিষিদ্ধ ক'রে দিলেন। প্রত্যাখ্যাত লর্ড্‌ অ্যাট্‌লী বললেন—'আমরা মনে করি না কেবল আমেরিকারই পরমাণু-শক্তি থাকা উচিত।' এবং শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের কাছে ব্রিটেন প্রথম পরীক্ষামূলক পরমাণু-বিস্ফোরণ ঘটাল 1952 সালের 3রা অক্টোবর। সাম্রাজ্যক্ষয়ের সেই মহালগ্নে ব্রিটেনের আহত অহংকারে পরমাণু-বোমার প্রলেপ প্রয়োজন ছিল।

এর সাড়ে-সাত বছর পরে ফ্রান্স্‌ও এই পরীক্ষা করে ( ফেব্রুয়ারী, 13 ; 1960 )। এই বিলম্ব উদাসীনতার নির্দেশক নয়। ম্যান্‌হাটান্‌ প্রোজেক্টে অংশ নিয়ে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, ফরাসী বিজ্ঞানীদের সে সম্পদ ছিল না। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামরিক শক্তির চূড়ান্ত ক্ষয়, ইন্দোচীন ও আলজেরিয়ায় তা'র ব্যর্থ কর্তৃত্ব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পরমাণু-বোমার সম্মান-ধ্বজা ফ্রান্স্‌কেও লালায়িত করে। উপরন্তু, 1946 সালের উল্লিখিত আইন আমেরিকা 1958-তে শিথিল করে, এবং মিত্রপক্ষীয় এমন দেশকে পরমাণু-অস্ত্র-সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নেয়—যে দেশ ঐ বিষয়ে "যথেষ্ট অগ্রসর"। ফ্রান্স্‌ দেখতে পায়—ঐ শিথিলতা কেবল ব্রিটেনের স্বার্থে। 'ন্যাটো'-গোষ্ঠীর ভিতরেই এই আচরণ-বৈষম্যে আহত ফ্রান্স্‌ স্বভাবতই পরমাণু-অস্ত্র তৈরীতে "যথেষ্ট অগ্রসর" হ'তে আগ্রহী হয়।

চীন প্রথম পরমাণু-বিস্ফোরণ ঘটায় 1964 সালের 16ই অক্টোবর। প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম হাতে নিয়ে চীন রাশিয়ার সহযোগিতায় অগ্রসর হ'তে থাকে 1954 সাল থেকে। কিছু রুশ বিজ্ঞানী চীনে আসেন ; কিছু চৈনিক বিজ্ঞানী দুব্‌নায় রুশ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সুযোগ পান। কিন্তু, জানা যায়, ক্রুশ্চেভ্‌ শেষ পর্যন্ত চীনকে পরমাণু-শক্তিতে স্বনির্ভর দেখতে চাননি, এবং চীনের এলাকায় রাশিয়ার পরমাণু-অস্ত্রের ঘাঁটি গড়ার প্রস্তাবেও চীন অসম্মত হয়। 1959 সালের পরে রুশ-চীন বিরোধ তুঙ্গে ওঠে ; চীন পরমাণু-অস্ত্রলাভের সাধনায় একাকী অগ্রসর হয়, এবং 1964-তে প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করে। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন ( 1965 )—অন্য আফ্রো-এশীয় দেশগুলোও নিজেদের পরমাণু-বোমা তৈরি ক'রে নিতে পারবে। মার্কিন এবং রুশ সাম্রাজ্য-বাদকে বাধা দেবার জন্যই ঐ অস্ত্র দরকার।

সবশেষে পরমাণু-বিস্ফোরণ ঘটায় ভারত ( 18ই মে ; 1974 )। বাতাসে এবং জলে বিস্ফোরণ না-ঘটাতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকায় এটি ভূ-গর্ভে ঘটাতে হয়। এই বোমায় ব্যবহৃত প্লুটোনিয়াম তৈরী হয় ক্যানাডা থেকে আনা পরমাণু-চুল্লী 'CIRUS'-এ, যা'তে ব্যবহৃত 'ভারী জল' প্রথমে দিয়েছিল আমেরিকা,—সবই 'শান্তিপূর্ণ' ব্যবহারের জন্য। অতএব, চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ স্বভাবতই আসে—যা' শেষ পর্যন্ত অপ্রমাণিত থেকে যায়। কারণ, ইতিমধ্যে ভারত ভারী জলের উৎপাদনে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল, এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী 'ভূ-গর্ভে খনিজ সম্পদ সন্ধান'কে ঐ বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে ঘোষণা করার উদ্দেশ্য 'শান্তিপূর্ণ'ই দাঁড়ায়। কিন্তু, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অবিশ্বাস এবং খারাপ প্রভাব এড়ানো যায় না।

পরমাণু-অস্ত্রের উৎপাদন এবং ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ প্রচেষ্টার গত চল্লিশ বছরের ইতিহাস অতি দীর্ঘ, এবং এই ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসারও এখানে তুলে দেওয়া অসম্ভব। সর্বপ্রথম পরিকল্পনাটি 1946 সালের, এবং 'বারুক্-প্ল্যান্' (Baruch-plan) নামে পরিচিত (আমেরিকার অর্বুদপতি এবং বহু প্রেসিডেণ্টের পরামর্শদাতা বার্নার্ড্ বারুক্-এর নাম অনুসারে)। এই পরিকল্পনার মুখ্য বক্তব্য ছিল ঃ আর কোন দেশ পরমাণু-অস্ত্র তৈরি করবে না ; একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শক দল সমস্ত দেশের পরমাণু-শক্তি উৎপাদন-ব্যবস্থা দেখে বেড়াবেন—খনি থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই ; এবং আমেরিকা তা'র পরমাণু-অস্ত্রের ভাণ্ডার ভবিষ্যতে নিঃশেষ ক'রে দেবে।—বলা বাহুল্য, তখন এই প্রস্তাবের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাশিয়া—পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ-শক্তি। রাশিয়া প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করে। তা'র মতে—ঐ পরিদর্শনের অজুহাতে নানা নাশকতামূলক বা নিরাপত্তাবিরোধী কাজ এবং দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হবে। পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ব্যবস্থা মেনে নেওয়া চলে। —আন্দাজ করা যায় ঃ ঐ মারণাস্ত্রের গঠন-কৌশল চিরকাল কেবল আমেরিকার আয়ত্তে থাকবে, এটা রাশিয়া মেনে নিতে পারেনি।

দ্বিতীয় এবং যথার্থ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা শুরু করেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ডুইট্ আইসেনহাওয়ার। তিনি 'Atoms for Peace' নামে একটি পরিকল্পনা 1953 সালে রাষ্ট্রসংঘে পেশ করেন, এবং 1957 সালে IAEA ( ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি ) গঠিত হয়, যা'র কাজ ছিল—পরমাণু-শক্তির কেবল শান্তিপূর্ণ ব্যবহার যা'তে হয়, তা'র চেষ্টা করা। 1959-এ বারোটি দেশ আণ্টার্কটিক্-চুক্তিতে স্বাক্ষর করে—যা'তে এই অঞ্চল পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাস্থল বা ঘাঁটি না-হয়। নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে 1963 সালটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বছরে শতাধিক দেশের আগ্রহে পরমাণু-অস্ত্রের 'আংশিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তি' ( বা PBT ) কার্যকর হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো বাতাসে বা জলে আর পরমাণু-বিস্ফোরণ না-ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতও এই চুক্তির অংশীদার। শক্তিশালী দেশগুলোর ভিতরে ফ্রান্স্ ও চীন PBT-র বাইরে রয়েছে। ইতিমধ্যে আমেরিকা ও রাশিয়া কোনো শর্তেই অন্য দেশকে পরমাণু-বোমা না-দিতে স্বীকৃত হয়, এবং ঐ বোমা তৈরীর সহায়ক যে কোনো উপাদান IAEA-র নিরাপত্তামূলক শর্তসাপেক্ষেই দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য, 1960-এর আগে পর্যন্ত চীনকে রাশিয়া পরমাণু-বোমা তৈরীর পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল, এবং আমেরিকাও 'ন্যাটো'-বন্ধুদের অনেকভাবেই সাহায্য দিয়ে আসছে। 1963 সালেই ঐ দুই বৃহৎ-শক্তি আকাশে বা মহাকাশে কোনো পরমাণু-অস্ত্র না-রাখতে স্বীকৃত হয়। এর

কয়েক বছর পরে (1967-তে) আমেরিকা ও রাশিয়া সহ প্রায় নব্বইটি দেশ একটি চুক্তিতে ( 'আউটার্ স্পেস্ ট্রিটি' ) আবদ্ধ হয়—যা'র বলে—চাঁদে বা অন্য কোনো গ্রহে পরমাণু-অস্ত্র রাখা বা পরীক্ষা করা, পৃথিবীর বা অন্য কোনো মহাকাশগত বস্তুর কক্ষপথে কোনো পরমাণু-অস্ত্র স্থাপন করা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু, সবচেয়ে বিতর্কিত চুক্তিটি হ'ল "পরমাণু-অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি" বা NPT ( 'নিউক্লিয়ার নন্-প্রোলিফারেশন্ ট্রিটি' )। 1968 সালে শেষ পর্যন্ত এই চুক্তিটি গৃহীত হ'লেও এর দশ বছর আগে থেকে এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলেছিল—যা'র ইতিহাস অতি দীর্ঘ।* এই চুক্তির অন্যতম অঙ্গ হ'ল—যে দেশের পরমাণু-বোমা নেই, তা'রা আর তা' তৈরি করবে না এবং সামরিক বা 'শান্তিপূর্ণ' কোনো উদ্দেশ্যেই পরমাণু-বিস্ফোরণ ঘটাবে না। নব্বইটির বেশী দেশ এতে স্বাক্ষর করলেও আর্জেণ্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, কিউবা, ফ্রান্স্, চীন, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদি আরব, স্পেন ইত্যাদি দেশ এতে স্বাক্ষর করেনি। এর পরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হয় 1971 সালে। সমুদ্রের নীচে কোনো পরমাণু-অস্ত্র রাখা হবে না—এই মর্মে সাতাশিটি দেশ চুক্তিবদ্ধ হয়। ফ্রান্স্ এই চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেনি, যদিও এই চুক্তির মনোভাবকে সে সম্মান করতে প্রস্তুত ব'লে জানিয়েছে। এর পরবর্তী একাধিক চুক্তির কথা বলা যায়, যা'র ভিতরে SALT I এবং SALT II দীর্ঘকালীন আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু, এইসব চুক্তি থেকে কার্যকর অগ্রগতি কতখানি হয়েছে তা' বলা শক্ত।

বিতর্কিত চুক্তি NPT সম্পর্কে সবচেয়ে অনমনীয় মনোভাব চীনের। চীন মনে করে—শক্তিমান দেশগুলোর সমস্ত নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবই কার্যত অন্য দেশকে বঞ্চিত ক'রে নিজেদের শক্তিমান করার কৌশল। পরমাণু-অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপের পরিকল্পনার প্রস্তাব কখনও বৃহৎ-শক্তিগুলো দেয়নি—যে ধরনের পরিকল্পনায় চীন সব সময়ে আগ্রহী। বহু দেশের হাতে পরমাণু-বোমা ছড়িয়ে পড়লেই যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ে, এটা চীন মনে করে না। তা'র মতে ধনতান্ত্রিক দেশের হাতে ঐ বোমা থাকলে বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে; সমাজতান্ত্রিক দেশের হাতে থাকলে শান্তিরক্ষায় সাহায্য হয়।—ভারতের মনোভাব এতখানি চরম নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী 1974 সালে রাজস্থানে পরমাণু-বিস্ফোরণ ঘটাবার অব্যবহিত পরেও

* NPT সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত, মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য পাঠক R. M. Lawrence ও J. Larus সম্পাদিত "Nuclear Proliferation : Phase II" (University Press of Kansas, 1974) বইতে সম্পাদকদের লেখা প্রবন্ধ "A Historical Review of Nuclear Weapons Proliferation and the Development of the NPT" দেখতে পারেন।

বলেছিলেন—ভারতের কোনো পরমাণু-বোমা নেই, এবং ঐ বোমা তৈরীর ইচ্ছাও তা'র নেই। কিন্তু, ভবিষ্যতে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা'র ঐ নীতি পুনর্বিবেচনার পথ সে খোলা রাখতে চায় ; এই কারণে সে NPT-তে যোগ দিচ্ছে না।*—রাশিয়ার দীর্ঘকালীন অসন্তোষ রয়েছে আমেরিকার বিরুদ্ধে।** তা'র মতে, আমেরিকা শুধু রাশিয়ার সমরশক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা নিরস্ত্রীকরণ-চুক্তির পরিকল্পনা করে, এবং একই সঙ্গে বন্ধুত্বের অছিলায় নানা মিত্রগোষ্ঠীর (যেমন, NATO-র) দেশকে পরমাণু-অস্ত্রের উপাদান সরবরাহ ক'রে যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। রাশিয়ার প্রধান দুশ্চিন্তা পশ্চিম জার্মানীর সমরসজ্জা নিয়ে,—অবশ্যই দু'টি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায়। পশ্চিম জার্মানী পরমাণু-বোমা তৈরী না-করতে যদিও অঙ্গীকারবদ্ধ, কিন্তু পরমাণু-শক্তি বিষয়ক গবেষণায় সে প্রথম থেকেই পৃথিবীর অত্যন্ত উন্নত দেশ, এবং আনুষঙ্গিক জিনিসের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে অত্যন্ত সফল।

এখন ক'টি দেশের হাতে পরমাণু-বোমা আছে আমরা জানি না। অনেক দিন আগেই বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—এখন কোনো দেশ ঐ অস্ত্র নতুন তৈরি করলেও পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাবার দরকার হয় না ; কারণ, ঐ অস্ত্রের নির্মাণ সম্পর্কে এত বেশী তথ্য প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে যে বিনা পরীক্ষাতেই ওর সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। অতএব, কোথায় কতগুলো মূর্তিমান ধ্বংস নিদ্রিত আছে, এবং কোন্ উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে হতবুদ্ধি মানুষ তা'দের ঘুম ভাঙাবে—বলা কঠিন। তা'ছাড়া, বিজ্ঞানের নানা উন্নতির সঙ্গে ঐ মারণাস্ত্রের নির্মাণ সহজতর হওয়াই সম্ভব, এবং এর পরিণাম কী হ'তে পারে কে জানে।

---

* বিশেষ দ্রষ্টব্য : Lawrence ও Larus সম্পাদিত উল্লিখিত বইতে K. Subramanyam-এর প্রবন্ধ "India : Keeping the Option Open". লেখক Indian Institute of Defence Studies and Analysis-এর তৎকালীন পরিচালক। ঐ প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামতকে যদিও প্রচলিত রীতি অনুসারে লেখকের নিজস্ব মত ব'লে জানানো হয়েছে, তবু মোটামুটিভাবে ঐ প্রবন্ধে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ পেয়েছে ব'লে মনে করা যায়।

** আমেরিকার পরমাণু-শক্তিসজ্জা সম্পর্কে রাশিয়ার সাম্প্রতিক মনোভাব সংক্ষেপে জানতে হ'লে পাঠক STAR WARS (Military Publishing House, Moscow ; 1985) দেখতে পারেন।

## পরিশিষ্ট 1 : প্রথম ঘটনা

1. প্রথম পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণ : জুলাই, 16 ; 1945। বিস্ফোরণের সাংকেতিক নাম TRINITY। প্রায় একশো ফুট উঁচু একটি স্তম্ভের উপরে রেখে এই বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হয় নিউ মেক্সিকো প্রদেশের [ যুক্তরাষ্ট্রে ] আলবুকার্কের 120 মাইল দক্ষিণ-পূর্বে।

2. শত্রু-দেশের উপরে প্রথম পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণ : আগস্ট, 6 ; 1945, জাপানের হিরোশিমা-শহরের উপরে ( মাটি থেকে 1670 ফুট উপরে )। বোমার সাংকেতিক নাম Little Boy। একটি B—29 বিমান থেকে এটি নিক্ষেপ করা হয়। বৈমানিক ছিলেন কর্ণেল টিবেট্‌স্‌ ( Paul W. Tibbets, Jr. ), বোমারু ছিলেন মেজর ফেয়ার্‌বী ( Thomas W. Ferebee )। বিমানের নাম ছিল Enola Gay। বৈমানিক নিজেই এই নাম রাখেন তাঁর মায়ের নাম অনুসারে।

3. জলের উপরে প্রথম পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণ : প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি উপহ্রদের উপরে ( 520 ফুট উপরে ) আমেরিকা এটি ঘটায় 30শে জুন, 1946এ। বিমানের নাম Dave's Dream ; বিস্ফোরণের সাংকেতিক নাম ABLE। জলের উপরে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে 73টি জাহাজ রাখা ছিল, যার মধ্যে দু'টি ডুবে যায়।

4. জলগর্ভে প্রথম পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণ : প্রশান্ত মহাসাগরে বিকিনি থেকে তিন মাইল দূরে আমেরিকা এই পরীক্ষা করে 24শে জুলাই, 1946-এ। বিমানের সাহায্যে 7000 ফুট উঁচু থেকে এটি নিক্ষেপ করা হয়, এবং জলের 90 ফুট নীচে বিস্ফোরণটি ঘটে। বিস্ফোরণের সাংকেতিক নাম BAKER। এই পরীক্ষা-মূলক বিস্ফোরণে দশটি জাহাজ ডুবে যায়।

5. ভূ-গর্ভে প্রথম পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণ : আমেরিকা ঘটায় 1951-র 29শে নভেম্বর নেভাডার 'ফ্রেঞ্চ্‌ম্যান্‌ ফ্ল্যাট্‌'-এ। কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং সামরিক অফিসারকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বিস্ফোরণে 800 ফুট ব্যাসের 100 ফুট গভীর একটি গর্ত তৈরী হয়।

6. প্রথম হাইড্রোজেন-বোমা বিস্ফোরণ : আমেরিকা ঘটায় মার্শাল্‌ দ্বীপপুঞ্জে 1লা নভেম্বর 1952-তে। বিস্ফোরণের সাংকেতিক নাম MIKE। কুড়ি ফুট উঁচু একটি স্তম্ভের উপরে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

7. পরমাণু-চুল্লী বা Atomic Reactor-এর প্রথম 'পেটেণ্ট্‌' পান এন্‌রিকো ফের্মি ( Enrico Fermi ) এবং লিও জিলার্ড্‌ ( Leo Szilard ) 17ই মে, 1956-তে। এঁরা দরখাস্ত পেশ করেছিলেন 19শে ডিসেম্বর, 1944-এ।

## পরিশিষ্ট 2 : পরমাণু-বিস্ফোরণের খতিয়ান

আজ অবধি পৃথিবীতে মোট কতগুলো পরমাণু-বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তা'র কোনো সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না; কারণ, পরীক্ষাকারী দেশ সব বিস্ফোরণের কথা ঘোষণা করে না। 1980 সাল পর্যন্ত একটি মোটামুটি হিসেব এখানে দাখিল করা যেতে পারে। ঐ সময় পর্যন্ত মোট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে 1200-র বেশী। 1963 সালের 10ই অক্টোবর থেকে 'আংশিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তি' (PBT) কার্যকর হওয়ায় ঐ সময়ের পরে অধিকাংশ বিস্ফোরণই ঘটানো হয়েছে মাটির নীচে; কিন্তু, বিস্ফোরণের বাৎসরিক হার যথেষ্ট কমেনি।

| | | বিস্ফোরণের সংখ্যা : মাটির উপরে ও নীচে | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| দেশের নাম | | (PBT-র আগে) | | (PBT-র পরে) | |
| | | উপরে | নীচে | উপরে | নীচে |
| আমেরিকা | — | 193 | 119 | 0 | 369 |
| রাশিয়া | — | 163 | 2 | 0 | 283 |
| ব্রিটেন | — | 21 | 2 | 0 | 10 |
| ফ্রান্স | — | 4 | 1 | 41 | 48 |
| চীন | — | 0 | 0 | 22 | 4 |
| ভারত | — | 0 | 0 | 0 | 1 |

জলের নীচে আজ পর্যন্ত মাত্র ছ'টি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।
আমেরিকা : মোট পাঁচটি [1946, 55, 58 (দু'টি), 62]
রাশিয়া : একটি [1961]

[এই পরিশিষ্টের সমস্ত তথ্যের উৎস : The Nuclear Almanac (Addison-Wesley, 1984) ]

আধুনিক বিশ্বের প্রধান মারণাস্ত্র 'পরমাণু-বোমা' একটি বহু আলোচিত বিষয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক বিশেষ অবস্থা এবং পদার্থবিজ্ঞানের এক অপূর্ব উন্নত দশার গ্রন্থিবন্ধনে এর উদ্ভব হয় চল্লিশের দশকে, এবং পরবর্তী দুই দশকের ভিতরেই সে মানবজাতির সামনে কার্যত এক কালোত্তীর্ণ আতংক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, তা' হ'লেও এই অস্ত্রের গঠন, ক্রিয়ানীতি এবং ধ্বংসক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা শিক্ষিত মহলেও ব্যাপকভাবে গ'ড়ে ওঠেনি। পরমাণু-বোমার বিজ্ঞানগত এবং ইতিহাসগত নানা দিক এই পুস্তিকার পাঁচটি পরিচ্ছেদে উপস্থিত হয়েছে সর্বশ্রেণীর পাঠকের সামনে। পরমাণু-বোমার বিজ্ঞানগত পটভূমি, তা'র গঠনের জটিলতার এবং তা'র ধ্বংসক্রিয়ার কারণ, প্রথম পরমাণু-বোমা গঠনের ইতিহাস অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে আলোচিত হয়েছে এই বইতে। পরিশেষে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্তমান বইটিকে পূর্ণতা দিয়েছে এর সীমিত পরিসরের ভিতরেও।

মূল্য : আট টাকা